পত্রাবলী।

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান।

শ্রী দিলীপ কুমার রায়।
বীরবল।
শ্রীঅতুল চন্দ্র গুপ্ত।

মুখ-পত্র।

আজ বছরখানেক ধরে শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়, বীরবল, ও শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত নানা মাসিক পত্রে যে সব খোলা চিঠি লিখেছেন, সেগুলি একত্র করে প্রকাশ করছি। যে উদ্দেশ্যে এ চিঠিগুলি একবার প্রকাশ করা হয়েছিল, সেই উদ্দেশ্যেই এ গুলি আবার প্রকাশ করছি। সে উদ্দেশ্য হচ্ছে, নব ফিজিক্স যে পুরোনো বিজ্ঞানের ভিত টলিয়েছে, এ বিষয়ে আমাদের শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। কারণ যাকে বলে বৈজ্ঞানিক সত্য, তা যে ইংরাজী-শিক্ষিত বাঙ্গালী সম্প্রদায়ের মনের উপর প্রভুত্ব করছে আর তাদের চিন্তার ধারাকে নূতন পথে নিয়ে যাচ্ছে, সে বিষয়ে আর সন্দেহ নেই।

শ্রীমান দিলীপকুমারই এ বিষয়ে প্রথমে বীরবলের ও অতুল বাবুর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। অর্থাৎ Bertrand Russell, Whitehead, প্রভৃতি ইংলণ্ডের অগ্রগণ্য গণিৎশাস্ত্রী ও বিজ্ঞানাচার্য্যদের মতামতের নূতন ধারার সঙ্গে বীরবলকে পরিচিত করিয়ে দেবার জন্য পত্র লেখেন। এই লেখকদ্বয়ের বিখ্যাত পুস্তকগুলির সঙ্গে তাঁদের পূর্ব্ব-পরিচয় ছিল, কারণ ফিজিক্স ও ম্যাথেমেটিক্সের অব্যবসায়ীরাও এ বইগুলি পড়তে পারেন ও কতক বুঝতে পারেন। কেননা ও বইগুলি আমাদের মত পাঠকের জন্যই লেখা। তাই বীরবল ও অতুলবাবু এ আলোচনায় যোগ দিতে সাহসী হন।

আমি বলেছি যে, নব ফিজিক্স পুরোনো বিজ্ঞানের ভিত টলিয়েছে। কারণ ফিজিক্সই হচ্ছে আদি ও সুপ্রতিষ্ঠিত বিজ্ঞান। আর যতরকম

উপ-বিজ্ঞান আছে, সে সব ফিজিক্সের অনুকরণেই গড়ে উঠেছে আর ফিজিক্সের পদ্ধতিই অবলম্বন করেছে। এ সব উপবিজ্ঞানের আশা ছিল যে, একদিন না একদিন তারা ফিজিক্সের অঙ্গে লীন হয়ে যাবে। আমরা যাকে বৈজ্ঞানিক মনোভাব বলি, তার ভিত্তিই হচ্ছে Newtonএর ফিজিক্স। সুতরাং সে ফিজিক্স যদি নব ফিজিক্সের ধাক্কায় অনবস্থাদোষে দুষ্ট হয়ে পড়ে, তাহলে তথাকথিত বৈজ্ঞানিক মনোভাবের দেশে ভূমিকম্প উপস্থিত হয়। আর তা যে হয়েছে, তার প্রমাণ Whitehead, Eddington,* Jeans, Millikan প্রভৃতির নব আলোচনার ভিতর যথেষ্ট পাওয়া যায়।

শ্রীমান দিলীপ তাঁর প্রথম পত্রের নামকরণ করেছিলেন "বিজ্ঞানের ট্রাজেডি"। এর অর্থ এই যে, ইউরোপে যাকে বলে Conflict of science and religion, এবং যে যুদ্ধে আজ দেড়শ বৎসর ধরে বিজ্ঞান ক্রমান্বয়ে জিত্‌ছে আর religion ক্রমান্বয়ে হেরে আসছে, এখন ফিজিক্সের রাজ্যে হঠাৎ revolution হওয়ায় বিজ্ঞান, সে ক্ষেত্রে একদম উল্টে পড়েছে; ফলে religion-এর অতঃপর জয় হয়েছে, কারণ তার বিরুদ্ধে লড়বার আর কেউ নেই। যেমন Russiaর অন্তর-বিপ্লবের ফলে, জর্ম্মাণী আর না লড়েও তার উপর রাতারাতি পুরো জয়লাভ করলে, এবং রুসিয়া Brest Litovsk-এর সন্ধিপত্র নতমস্তকে শিরোধার্য্য করতে বাধ্য হল।

এই কারণেই অতুলবাবু তাঁর প্রথম পত্রের নাম দিয়েছেন "ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান"। এবং সে পত্রে তিনি দেখাতে চেষ্টা করেছেন যে, নব ফিজিক্স পুরোনো ধর্ম্মমতকে প্রমাণ করেনি, শুধু তথাকথিত Scientific philosophyকে ধাক্কা লাগিয়েছে।

এ কথা ঠিক। উপরে যে সব মনীষীদের নাম করলুম, তাঁরা সকলেই ধর্ম্মধ্বজীও নন্, ধর্ম্মপ্রবণও নন্। Russell যে ঘোর ধর্ম্মবিদ্বেষী, তা তাঁর "Why I am not a Christian" নামক চটি বই পড়লেই জানতে

পাবেন। এখানি ত্রিশ পাতার বই, আর তার দাম তিন পেনি। অপরপক্ষে Whitehead ঘোর ধর্ম্মপ্রাণ লেখক; কিন্তু তিনি ধর্ম্মের পক্ষে নব ফিজিক্সের দোহাই কোথাও দেন নি। কারণ তাঁর একটা নব ফিলজফি আছে, যা Scientific philosophyর উপরে উঠে গিয়েছে, আর সেই ফিলজফিই তাঁর ধর্ম্মবিশ্বাসের অটল ভিত্তি। Eddington ব্রাহ্ম খৃষ্টান—ইংরাজীতে যাকে বলে Quaker; কিন্তু তিনিও স্পষ্ট করে বলেছেন যে, নব ফিজিক্স ধর্ম্ম প্রমাণ করে না। Vide Science and Religion, by Professor Sir Arthur Eddington। এ পুস্তিকারি দামও তিন পেনি, আর পত্রসংখ্যা ষোলো। তিনি অবশ্য নাস্তিক নন। তাঁর কথা হচ্ছে—

অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পর যচ্চ তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥

(শঙ্করধৃত বচন)

ফিজিক্সের কারবার সুধু প্রকৃতি নিয়ে। আর এ কারবার সুধু মাপযোখের কারবার। তারপর Jeans-এর পুস্তকদ্বয়ে ধর্ম্মের নামগন্ধও নেই। Jeans অবশ্য গ্রহনক্ষত্র ও পরমাণুর কাছ থেকে জানতে পেরেছেন যে, এ বিশ্বের সৃষ্টিস্থিতি আর প্রলয় আছে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, তাঁর মতে—

নারায়ণঃ সর্ব্বমিদং পুরাণঃ।
স সর্গকালে চ করোতি সর্গং
সংহারকালে চ তদত্তি ভূয়ঃ॥ ইতি।

(শঙ্করধৃত বচন)

কিন্তু এ নারায়ণটি যে কে, সে বিষয়ে তিনি নীরব। বোধহয় তাঁর মতে এ নারায়ণ হচ্ছেন অদ্বিতীয় mathematician, আর তিনি এ বিশ্ব গড়েছেন

equation দিয়ে। এ আস্তিকতার সঙ্গে মানুষে যাকে ধর্ম্ম বলে, তার কোনও সম্পর্ক নেই। তারপর Millikan খৃষ্টধর্ম্মযাজকের পুত্র এবং ফিজিক্সের কাছ থেকে তিনি অদ্যাবধি এমন কোনও তত্ত্ব লাভ করেননি, যাতে করে তিনি তাঁর পৈত্রিক ধর্ম্ম জলাঞ্জলি দিতে প্রস্তুত। এক বিষয়ে শুধু তাঁর মত Jeans-এর মতের সম্পূর্ণ বিরোধী; বিশ্বের যে পূর্ব্বে একদিন সৃষ্টি হয়েছিল, আর পরে একদিন প্রলয় হবে, তাঁর মতে radiation তা প্রামাণ করে না। একদিকে যেমন পরমাণু আলোকে পরিণত হচ্ছে, অপরদিকে তেমনি আলোক আবার পরমাণুতে পরিণত হচ্ছে, অতএব বিশ্ব অনাদি ও অনন্ত।

সংক্ষেপে এই সব বিজ্ঞানাচার্য্যদের ধর্ম্মমত উল্লেখ করলুম এই জন্যে যে, এঁরা সকলে পরস্পর বিভিন্ন প্রকৃতির লোক, যদিচ সকলেই ফিজিক্সের নবতত্ত্ব সাগ্রহে প্রচার করতে উদ্যত হয়েছেন। ধর্ম্ম বনাম বিজ্ঞানের মামলায় এঁরা কেউ আপোষ মীমাংসা করতে বিন্দুমাত্র চেষ্টা করেননি। লৌকিক আলোক পরমাণুচূর্ণ হ'তে পারে, কিন্তু দিব্য আলোক পরমাণুর বুকফেটে বেরয় না—আসে তার পাশ কাটিয়ে।

নব ফিজিক্স সনাতন ধর্ম্মমতকে ঠেলে তোলেনি, গত শতাব্দীর Scientific philosophy-কে চিৎ করেছে। এবং যে ক্ষেত্রে উক্ত বিজ্ঞানমুগ্ধ দর্শন ধর্ম্মের পরিপন্থী ছিল, সে ক্ষেত্রে নব ফিজিক্সকে ধর্ম্মের সহায় বলা যেতে পারে। যে কারও শত্রুনিপাত করে, তাকে তার রক্ষক বলায় আপত্তি নেই। এই হিসেবে এ আলোচনাকে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের আলোচনা বলা যেতে পারে। সুতরাং এ পত্রাবলীর ঐ নামই রাখলুম।

তথাকথিত Scientific philosophy-র অন্তর্নিহিত metaphysics যে কি, আর new physics যে সে metaphysicsএর মূলচ্ছেদ করেছে,

তা প্রমাণ করতে হলে, সেই পুরোনো metaphysics এবং new physicsএর পরিচয় দিতে হয়; আর সে পরিচয় এ আলোচনাসূত্রে দেওয়া হয়নি।

এর প্রথম কারণ, ফিজিক্সের আলোচনা আমাদের অধিকারবহির্ভূত; আর দ্বিতীয় কারণ এই যে, নব ফিজিক্সের কিঞ্চিৎ পরিচয় না দিয়ে তার metaphysics-এর আলোচনা করাটা একরকম হাওয়া নিয়ে কারবার করা। এখন আপনাদের একটা সুখবর দেই। বাঙলায় যাঁরা এ বিষয়ে কথা কইবার যথার্থ অধিকারী, অর্থাৎ যাঁরা বিজ্ঞানশাস্ত্রের গভীর চর্চ্চা করেন, তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ বাঙলা ভাষায় নব-ফিজিক্সের পরিচয় দিতে ব্রতী হয়েছেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শিশির কুমার মিত্র electron-এর জন্মকথা অতি সহজ বাঙলায়, অতি বিশদ ভাবে আমাদের শুনিয়েছেন। তারপর অধ্যাপক শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ বসু নব-ফিজিক্সের সব নবতত্ত্ব বাঙালী পাঠকদের বুঝিয়ে দিতে কৃতসংকল্প হয়েছেন; আর এ বিষয়ে তাঁর প্রথম প্রবন্ধ "পরিচয়" পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। আমরা আশা করি যে, সত্যেন্দ্রবাবুর মুখে আমরা নব-ফিজিক্সের সকল গূঢ়তত্ত্বই জানতে পাব।

তারপর পদার্থবিজ্ঞানের metaphysics সম্বন্ধে ভবিষ্যতে যথাসাধ্য আলোচনা করবার আমার ইচ্ছা রইল। কারণ আমাদের একটা metaphysics চাই-ই চাই। নব-ফিজিক্স যদি আমাদের শূণ্যবাদ অঙ্গীকার করতে বাধ্য করে ত তাই করা যাবে।

ইতিমধ্যে আমি বাঙালী পাঠকদের বক্ষ্যমান ইংরাজী পুস্তকগুলি পড়্‌তে অনুরোধ করি। আর ও পাঁচখানা বই পড়বার যাঁদের সুযোগ কিম্বা অবসর নেই, তাঁদের নিম্নলিখিত ফর্দ্দের একমাত্র শেষ বইখানির উপর একবার চোখ বুলিয়ে যেতে অনুরোধ করি। Jeans-এর এ বইখানি প্রথমতঃ ছোট, দ্বিতীয়তঃ অতি সুখপাঠ্য। এ অনুরোধের কারণ, এই পত্রাবলীতে এঁদের সব কথা আছে। এই পত্রাবলীর পরিশিষ্টস্বরূপে

আমার একটি পূর্ব্বপ্রবন্ধও জুড়ে দিলুম, তার থেকে দেখতে পাবেন যে, সুধু ইংলণ্ডে নয়, ফ্রান্সেও এ তর্ক উঠেছে।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

পুস্তকের তালিকা।

1. Science and the Modern World.—Whitehead.
2. The Nature of the physical World.—Eddington.
3. The Universe Around Us.—Jeans.
4. Science and the New Civilization—Millikan.
5. The Mysterious Universe—Jeans.

১লা অক্টোবর, ১৯৩১।

বিজ্ঞানের ট্রাজিডি।*

খোলা চিঠি

শ্রীদিলীপকুমার রায়

—বীরবল সমীপেষু—

Our age has made an idol of the brain
The last adored a purer presence ; yet
In Asia like a dove immaculate
He lurks deep-brooding in the hearts of men.

(*Sri Aurobindo*)

The simple faith (in science) which upheld the pioneers is decaying at the centre......In our day those remote from the centres of culture have a reverence for science which its augurs no longer feel...Most men of science in the present day are very willing to claim for science no more than its due and to concede much of the claims of other conservative forces such as religion.

(*Is Science Superstitious!.........Bertrand Russell*)

Apart from religion human life is a flash of occasional enjoyments lighting up a mass of misery, a bagatelle of transient experience.

(*Religion and Science—Science and the Modern World...Whitehead*)

* উত্তরা, কার্তিক, ১৩৩৬।

সুপ্রতিষ্ঠিতেষু—

আপনার চিঠি দু'খানি পেয়ে মনটা খুসি হ'য়ে উঠ্‌ল। শুধু আপনার চিঠির বক্তব্যের জন্যে নয়,—(সুপ্রসিদ্ধ সমালোচক অতুলগুপ্ত মহাশয়ের ভাষায়)—আপনার লেখার প্রসাদ গুণের জন্যেও বটে। আপনার লেখা চিন্তাশক্তিকে সক্রিয় করে—তার মধ্যেকার (আপনার ভাষায়) "লজ্জতের" জন্যে,—যেমন রাগালাপের লজ্জত আমাদের সঙ্গীতবোধকে সক্রিয় করে। একটা লাগসৈ মিড় বা যুৎসৈ গমকে কোন্ সঙ্গীত-রসিক ঘাড় না নেড়ে পারেন! তাই আপনার চিঠি পড়ে মহা গবেষণা ক'রে এক উত্তর লেখার ইচ্ছে হ'ল।

হয়ত সে-ইচ্ছে কার্য্যে পরিণত করবার মতন অতটা প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ত না—যদি সঙ্গে সঙ্গে মান্দ্রাজের New Era কাগজে আপনার "Future of Civilization" লেখাটি চোখে প'ড়ে না যেত। প্রবন্ধটি এত ভাল লাগ্‌ল যে এ-পত্রের গোড়ায় গুটিতিনেক উদ্ধৃতাংশ প্রথমেই মনে প'ড়ে গেল।

আপনার চিঠি ও প্রবন্ধটির মধ্যে দিয়ে কিন্তু আপনার চিন্তার যেন একটা নতুন ধারার সঙ্গে পরিচয় লাভ করা গেল। কিম্বা হয়ত আমিই সম্প্রতি কোনো ব্যক্তিগত কারণে আপনার লেখার মধ্যে এ ধারাটি সবপ্রথম আবিষ্কার করলাম? কে না জানে আমাদের অনুভূতির রূপান্তরে আমরা একই লেখা থেকে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন জিনিষ খুঁজে পাই? কিন্তু সে-কারণ যাই হোক্, আপনার লেখার মধ্যে একটা নতুন ধরণের জিজ্ঞাসাবাদ ঠিক্ এ-সময়ে ভারি মুখরোচক লাগ্‌ল। আমাদের সাহিত্য-রাগিণীতে যে আপনি একটা নতুন ধরণের সংশয় ও রসিকতার তান লাগিয়ে তাকে সমৃদ্ধি দান করেছেন একথা আপনার একান্ত বিদ্বেষী ছাড়া সকলেই স্বীকার করেন। আপনার চিঠি ও

প্রবন্ধটিতে আপনার যে সংশয়-তীরন্দাজি যেন আরও উপভোগ্য হ'য়ে উঠেছে। কেন জানেন?—কারণ আপনি গঙ্গাপূজা করেছেন গঙ্গাজলেঃ—ওদের সংশয়ী ব্যঙ্গকে দিয়েই ওদের সংশয়-বাদের তর্পণ ক'রেছেন! আপনার প্রবন্ধটি হাতের কাছে নেই। কিন্তু মনে হচ্ছে, তার মধ্যে এক যায়গায় আপনি ব'লেছেন, সংশয়াত্মক সমালোচনা হচ্ছে সেই শ্রেণীর তরোয়াল, যার দুদিকেই ধার আছে এবং সেই জন্যে পাশ্চাত্য জগতের সব তাতেই-সংশয়-প্রকাশ-করাকেও সংশয়াত্মক সমালোচনায় তছনছ ক'রে দেওয়াই হচ্ছে পন্থা। কথাটা ভারি ভাল লেগেছে। কারণ ওদের সংশয় অস্ত্রটি আমাদের বাঁচার বিষম পরিপন্থী—বোধ হয় ওদের অস্ত্র-শস্ত্রের চেয়েও। অস্ত্রশস্ত্র শুধু বাস্তব অন্নব্রহ্মের পিছনে লেগেই ক্ষান্ত হয় ব'লে তাকে যোঝাও অপেক্ষাকৃত সহজ—কিন্তু ওদের সংশয় দীক্ষার লক্ষ্য একেবারে আমাদের কল্পলোকবাসী আনন্দ ব্রহ্মের ওপর—যার মূলে প্রতি জাতির raison-d'etre নিহিত। কাজেই, এ শেষোক্ত প্রক্রিয়াই হচ্ছে আমাদের সত্যি সত্যি ভাতে মারা; ভাতে মারা যাকে বলি এর তুলনায় সে নিতান্ত স্থূল হাতে মারা। ওরা আমাদের আধিভৌতিক প্রতিপত্তিকে ম্লান করতে চায়—তার প্রতিষেধ পলিটিক্স আছে, 'ব্লাফ্' আছে, অ্যাক্টিভিসম্ আছে, আরও কত কি ইস্‌মের বর্ম্ম আছে। থাকুক। কিন্তু যখন ওদের তাতেও মনস্তুষ্টি হয় না,—যখন ওরা আমাদের সৌন্দর্য্য-জগতের, চিন্তাজগতের ও আধ্যাত্মিক জগতেরও প্রতিপত্তি নষ্ট করতে আমাদের মনের গোপন স্তরে সংশয়ের সুড়ঙ্গ কাটতে লেগে যায়, তখন ব্যাপারটা সঙীন হ'য়ে ওঠেই ওঠে। কেন না এর প্রতিষেধ অপেক্ষাকৃত দুর্লভ। প্রমাণ ত হাতেহাতেই মেলে। আমরা যে আজ ওদের সব কিছুকেই হুবহু নকল করতে ব'সে'ছি তার মানে কি পূরবী সুরে দ্বিজেন্দ্রলালের সেই করুণ গানটি গাওয়া নয় যে—

'হাহা মশাই, আমরা সবাই প'ড়েছি এক ভাবনায়,
ভেবে দেখ্‌লাম আমা'দর আর বেঁচে কোনোই লাভ নাই ?'

আমাদের জাতীয় raison-d'etre কি আজ অষ্টপ্রহর এই রিক্ততা রাগিণী নিঃসম্বল তালে গাইছে না ? এই হতভাগ্য দেশের পেছনেও যে উইলিয়াম আর্থার মিস্ মেয়ো প্রমুখ সকলে উঠে প'ড়ে লিখেছেন ভেবে দেখুন সেটার ভিতরকার মনস্তত্ত্ব কি ? 'বলং বলং বাহুবলং'-ই যদি কোন জাতির বেঁচে থাকার একমাত্র অস্ত্র হ'ত, তাহ'লে আমাদের সভ্যতাকে এ-ধরণের অন্তরটিপুনি দেওয়ার এ-রকম মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা'র সদর্থ থাকৃত কি ? আসল কথা, পাশ্চাত্য সভ্যতা আজ বুঝেছে যে, প্রাচ্যকে যদি জয় করতে হয় তবে তার অন্নজগৎকে জয় করলেই হবে না—তার প্রাণ-মন বিজ্ঞান আনন্দ এই সব জগৎকে জয় করা আগে দরকার। তাই বলছি, ওদের সংশয় আমাদের মনে চারিয়ে দিয়ে ওরা যে উদ্দেশ্যটি সিদ্ধ ক'রে নিতে চাইছে, সেটাই হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে আমাদের জাতে-মারা।

কিন্তু এখানেও ওদের স্বপক্ষে একটা কথা বলা যায়। বিশ্বাসরূপ 'রাধে-কৃষ্ণ' যার আছে তাকে মারে কে ? বাইরের নানা বিরুদ্ধ শক্তি আমাদের বিশ্বাসরূপ দুর্গকে জখম করতে পারত কি—যদি দুর্গের ভিতরও সংশয়ানুকূল বিভীষণদের গতিবিধি না থাকৃত ? আমরা নিজেরাও যে এ সব ইঙ্গিতকে প্রশ্রয় দিতে চাই আমাদের কোনো ভাতেই ভিটামাইন নেই,—না আধিভৌতিক ভাতে, না আধ্যাত্মিক ভাতে। কাজেই, আপনি আপনার চিঠিতে যে 'অমুকের' ঘাড়ে বার্টরাণ্ড রাসেলের ভূত-চাপার জন্যে দুঃখ করেচেন তার জন্যে দায়ী একা রাসেল নন। কই চাপুক দেখি, ও ভূত জাপানের কাঁধে ? এবারকার 'প্রবাসী'তে তাঁর 'ধ্যানী জাপান' প্রবন্ধটিতে রবীন্দ্রনাথ ইঙ্গিত ক'রেছেন জাপানের সত্যিকারের অন্তঃশক্তির প্রতিষ্ঠা কোথায়। সামরিকতা হচ্ছে এ প্রতিষ্ঠার

বাহ্য রূপ মাত্র। পায়ের উপর ভর দিয়ে দাঁড়ানো যায় কেবল তখনই, যখন রাশ থাকে পায়ের চেয়ে উচ্চতর শক্তির হাতে। আর ভূতও চাপে কেবল তারি ঘাড়ে, যার পেটের ভাতে ভিটামাইন নেই। তাই শুধু ওদের টেবিল চেয়ার নয় ওদের 'ইস্‌ম্‌' গুলির ঝাড় বাসা বেঁধেছে একান্ত-ভাবে আজ আমাদেরই মাথায়। অতএব শুধু 'অমুকের' দোষ দেন কেন। আপনিই ত একদিন লিখেছিলেন না যে, নব্য বাঙালী দেখ্‌লে আপনার মনে প্রশ্ন জাগে:—'কাটামুণ্ডু কথা কয়?' কথাটা আজ স্মরণ করুন—কারণ, ও কথাটা ছিল আপনার একটি লাখ কথার এক কথা—a-la-Birball—par-excellence কথা।

কেবল—মুস্কিল কি জানেন? মুস্কিল হচ্ছে এই যে, মুণ্ডুর চেয়ে কথা বড়—অন্ততঃ আমাদের কাছে। কথা কওয়ার উৎসাহে তাই আমরা ভুলেই গেছি যে, যে-মুণ্ডু জিভ নাড়ছে, সে-মুণ্ডুর সঙ্গে দেশের ধড়ের—শিক্ষা, দীক্ষা, বৈদগ্ধ্য, ঐতিহ্য এসবের—কোনো সম্বন্ধই নেই। কিন্তু আমাদের মনস্তত্ত্বের ব্যাখ্যা যাই হোক্ না কেন—নিদানতত্ত্বটি (diagnosis) আপনার খাঁটি। নইলে কি ওদের ইস্‌ম্‌-অক্ষৌহিণী—(ইন্‌ডাষ্ট্রিয়ালিস্‌ম্‌, ক্যাপিটালিস্‌ম্‌, কম্যুনিস্‌ম্‌ থেকে আরম্ভ ক'রে ইন্‌টেলেক্‌চুয়ালিস্‌ম্‌, মডার্ণিস্‌ম্‌, অ্যাক্টিভিস্‌ম্‌ প্রভৃতির প্রত্যেকটিই) আজ আমাদের দেহ, মন, প্রাণকে এমন ভাবে আচ্ছন্ন ক'রে ফেলতে পারত কখনো? এবারকার সাক্ষাৎ জাতীয় রাষ্ট্রসভার সভাপতি জহরলাল ত সেদিনও প্রকাশ্যেই বলেছেন—আমাদের কিছুই নেই—সঙ্গীত, কলা, সাহিত্য, দর্শন, সামাজিকতা—সবেই অষ্টরম্ভা; অতএব ঔষধ কি? না, সব দলে দলে মনেপ্রাণে সাহেব কম্যুনিষ্ট ব'নে যাও, বিশ্বাসকে পুলিপোলাও চালান দাও,—কেবল যুক্তি ও সায়েন্স্‌কে মাথায় তুলে নাচো। নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতে হয়নায়। এই হচ্ছে আজকের দিনে আমাদের দেশের মডার্ণিস্‌মের মোদ্দা কথা।

একথা সত্যি যে, হিন্দুরা শ্রদ্ধা বিশ্বাস প্রভৃতি গুণকে যত বড় ক'রে দেখেছে বুদ্ধি যুক্তি প্রভৃতি গুণকে তত বড় ক'রে দেখে নি। বস্তুতঃ এ-বিষয়ে হিন্দুজাত এতই একগুঁয়ে ও 'ইনকারিজিব্‌ল্‌' যে অমন যে য়ুরোপ-স্নাত রবীন্দ্রনাথ তিনিও কি না এই বাক্যদৃপ্ত, বুদ্ধিদৃপ্ত, তর্কতৃপ্ত ইঙ্গবঙ্গের যুগে ফস্‌ ক'রে লিখে বল্লেন :—

'বাক্যের ঝড় তর্কের ধূলি অন্ধ-বুদ্ধি ফিরিছে আকুলি
প্রত্যয় আছে তারি মাঝখানে নাহি তার কোনো ত্রাস?'

সাধে কি কিপলিং সাহেব প্রাচ্য ও প্রতীচ্যকে ভাসুর-ভাদ্রবৌয়ের চোখে দেখেছিলেন? না, সাধে গল্‌স্‌ওয়ার্দ্দি এই সে-দিনও লিখেছেন যে, ভারতীয় স্নায়ুতে রক্ত বয়ই আলাদা ভাবে? * এর পরেও ভারতের দর্শন চিন্তাধারা প্রভৃতি ওরা বুঝতে না-পারায় আপনি আশ্চর্য্য হ'ন? আমাদের উদ্ভট মনস্তত্ত্ব ওরা বুঝবে কেমন ক'রে বলুন ত? আমেরিকান শিক্ষিত নরনারীর লিঞ্চিঙের মনস্তত্ত্ব কি আমরাই বুঝতে পারি? তাই প্রাচ্য মনীষীরা বলেন যে, বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম বিশ্বাস ও যুক্তি, অদৃষ্টবাদ ও পুরুষকার, চরকির মতন ঘোরা ও ধ্যানস্তিমিতনেত্রে ব'সে থাকা এরা পরস্পরের কাছে চিরদিনই দুর্ব্বোধ্য থাকবে। আর যদি একান্তই বুঝতে হয় তবে হয় ওদের পরতে হবে আমাদের স্থির-বিশ্বাসের ঠুলি, না হয় আমাদের পরতে হবে ওদের অস্থির বুদ্ধির জাজ্জ্বল্যমান চশ্‌মা। অন্ততঃ, এই কথাই অনেক শিক্ষিত লোকে বলছেন আজকের দিনে—ওদের ও আমাদের উভয় দেশেই। এই কথাটা আজ একটু আলোচনা করতেই আপনাকে এই পত্রাঘাত।

প্রথমেই ব'লে রাখি যে, আমি আজ বিশেষ ক'রে সংশয় প্রকাশ করব ওদের বিজ্ঞানের চতুর্ব্বর্গদায়িত্ব ও বিশ্বাস-নিরপেক্ষতার দাবী সম্বন্ধে।

* তাঁর বিখ্যাত উপন্যাস Forsyte Soga-র শেষ উপসংহার Swan Song উপন্যাস ১, ২, ৩, পৃষ্ঠা।

আপনি আপনার প্রবন্ধে একটা কথা বড় ভাল ব'লেছেন, যে যদি কেউ সমালোচনার গোলাগুলিতে ওদের সভ্যতার কোনো আত্মম্ভরিতার দুর্গকে একটুও জখম করতে পারে, তাহ'লেও সে গৌণতঃ আমাদের সভ্যতার একটা মহা শুভানুধ্যায়ীর কাজ করবে। কেন না, তাহ'লে আর কিছু না হোক্ অন্ততঃ আমাদের একটু বিজ্ঞভাবে ত ওদের বলারও পথ থাক্‌বে যেঃ—

'There are more things in heaven and earth, Russellio, than is dreamt of in your science!' এটাই কি কম লাভ আমাদের টলমলায়মান আত্মসম্মানের পক্ষে? তাই আমি ওদের বিজ্ঞান-সভ্যতার কয়েকটা fundamental assumption-এর পানে শব্দভেদী বাণ ছাড়ব—ওদেরই কথা উদ্ধৃত ক'রে। (অর্থাৎ, আপনারই পদ্ধতি অনুসারে ওদের সংশয়বাদকে দিয়েই ওদের সংশয়বাদকে নিরস্ত করার প্রয়াস পাব আর কি।)

ওদের বর্ত্তমান বিজ্ঞান-সভ্যতার প্রতিষ্ঠাকার্য্যে ওদের সব চেয়ে প্রধান অস্ত্র কি? না, পরীক্ষার কষ্টিপাথর ও সাক্ষ্য না পেলে সব কিছুকেই অবিশ্বাস করার প্রবৃত্তি;—আর প্রধান অস্ত্রী বা কর্ণধার হচ্ছেন কি? না, বুদ্ধি, যুক্তি। এখন, ওদের আমরা যতই ম্লেচ্ছ, অনাচারী ব'লে গালাগালি দেই না কেন, এটা মান্‌তেই হবে যে, এ দুটি অস্ত্রে ওরা শুধু আমাদেরই জখম করেনি, বা শুধু নিজেদের দেশেরই বিশ্বাস-জগতের অন্ন মারে নি, মানব-সমাজের অনেক জঙ্গলও সাফ ক'রেছে। বুদ্ধি ও যুক্তির আলো আবাহন করার ফলে বিজ্ঞানের যুগে মানুষ মধ্যযুগের চেয়ে মোটের ওপর বেশি সুখী হ'য়েছে কিনা এটা প্রমাণ করা অত্যন্ত কঠিন বটে—(যেহেতু মানুষের সুখ-অসুখকে মাপাজোপা ভারি শক্ত কাজ)—কিন্তু একথা বোধ হয় বলা চলে যে, বিজ্ঞান ও বুদ্ধির অরুণোদয়ে এমন

অনেক কুয়াশা ও কাঁটাবন মানবসমাজ থেকে অর্দ্ধচন্দ্র লাভ ক'রেছে—যাদের ফিরিয়ে আনতে আমরা কেউই চাই না। বিজ্ঞান, বুদ্ধি ও বিচারের প্রতিপত্তির মূল এইখানেই, যার জন্যে বিখ্যাত ফরাসী সুধীও এমন কথা বলতে ভয় পান নি যে 'Les choses du monde ne m'interessent que sovs le rapport de l'intellect, tout par rapport a l'intellect. Bacon dirait que cet intellect est un ldol * J'y consens, mais je n'en ai trouve de meilleure.' অর্থাৎ কি না বুদ্ধি ছাড়া জগতে আছে কি? আর বুদ্ধির চেয়ে বড় দেবতা যখন মিলছে না তখন আর কাকেই বা চালকলা দেওয়া যাবে?'

এর উত্তরে কেউ যদি বলেন কেন, বিশ্বাস, শ্রদ্ধা, সহজবোধ, ইন্‌টুইশন—এসব দেবতাও ত আছেন। তাহ'লে ওরা বলে—থাকলে কি হবে? ওদের স্থান যে বুদ্ধির নীচে, বিজ্ঞানের নীচে। কেন? না, বিজ্ঞান হচ্ছে সত্যপন্থা বিচার-প্রতিষ্ঠিত, পরীক্ষালব্ধ শক্তি, আর বিশ্বাস প্রভৃতির ফলাফল হচ্ছে—at best—অনিশ্চিত, ছায়াচ্ছন্ন unreliable, mystic ; অন্ততঃ (ওরা বলে) এটা ধ্রুব যে, যেখানেই বুদ্ধি ছাড়া অন্য কোন শক্তিকে বেশী প্রশ্রয় দেওয়া হ'য়েছে সেখানেই সে মানুষের মাথায় চ'ড়ে ব'সেছে। আর ফল হ'য়েছে রাজ্যজোড়া কুসংস্কার, দেশজোড়া ভয়ত্রাস, হৃদয়জোড়া নিষ্ঠুরতা ও প্রাণজোড়া mysticism, occultism, obscurantism প্রভৃতি। সুতরাং (ওরা সিদ্ধান্ত ক'রে ব'সেছে) মানুষের ভবিষ্যৎ প্রগতি নির্ভর করছে—এক বিজ্ঞানের উৎকর্ষে ;—যেহেতু একমাত্র বিজ্ঞান প্রভুই সংসারে অযৌক্তিক বিশ্বাসকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে চলতে সক্ষম—যার ফল :—বললাভ, বীর্য্যলাভ, আলোকলাভ।

* Variete—Paul Valerie (ফরাসী আকাদেমির)

বিজ্ঞানের ফলে মানুষ যে অনেকখানি বলবীর্য্য লাভ ক'রেছে একথা সকলেই মানবে। অন্ততঃ আজকের দিনে কেউই (মধ্যযুগের পাদ্রী-সম্প্রদায়ের মতন) বিজ্ঞানের দানকে নিছক জড়বাদ বা স্বাচ্ছন্দ্যবাদ-মূলক বলবে না। বিজ্ঞানকে অযথা ছোট প্রতিপন্ন করতে চাওয়াও আমার ছদ্ম দুরভিসন্ধি নয়। আমি শুধু আধুনিক বৈজ্ঞানিকদেরই লেখা থেকে একটু-আধটু উদ্ধৃত ক'রে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই দুটি সত্যের প্রতি:—(১) বিজ্ঞানকে সাধারণে যে ভাবে বিশ্বাস নিরপেক্ষ মনে ক'রে থাকে, সে-ধারণাটি ভ্রান্ত মনে করার সঙ্গত কারণ আছে; ও (২) ধর্ম্মের যুগকে চিরদিনের জন্যে গত মনে করার সঙ্গত কারণ নেই। বলা বাহুল্য, প্রথম উক্তিটি যদি অসত্য না হয়, তাহ'লে দ্বিতয়টির সত্য হওয়ার সম্ভাবনাও একটু বাড়ে। কারণ ধর্ম্মের প্রতিপত্তি কমার একটা প্রধান হেতু এই যে, ওর অস্তিত্ব বিশ্বাসের ওপর খুব বেশী নির্ভর করে। কাজে কাজেই যদি বিশ্বাসের প্রতিপত্তি বাড়ানো যায় তাহ'লে ধর্ম্মের অনেকখানি নষ্ট-গৌরবকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব। তাই এই বিষয়টা নিয়েই আগে একটু ভেবে দেখা মন্দ নয়।

বিজ্ঞানের প্রথম অভ্যুদয়ের সঙ্গে সঙ্গে—সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে*—যে মানুষের মনে একটা প্রচণ্ড উৎসাহ দেখা দিয়েছিল এটা নিঃসন্দেহ। মানুষ একটা নতুন আশার বাণী শুনে বড় গলা ক'রে বলতে আরম্ভ করল যে ঈশ্বর, রহস্য, ধর্ম্ম—ওসব হচ্ছে নিছক দুর্ব্বলতা,

* বিজ্ঞানের প্রধান কথা—প্রকৃতিকে দেখ, বোঝ, জান। এ বাণীটি প্রথম প্রচার করেন রজার বেকন—ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ায়। কিন্তু বিজ্ঞান ব্যাপক হ'য়ে ওঠে সব প্রথম—সপ্তদশ শতাব্দীতে কোপর্নিকসের মৃত্যুর পরেই ও গালিলিওর জীবদ্দশায়—যদিও আরিষ্টটেল, আর্কিমিডিস, দাভিন্চি প্রভৃতি নানা লোকে ভিন্ন ভিন্ন যুগে বৈজ্ঞানিক কৌতূহলের পরিচয় দিয়েছিলেন।

কুসংস্কারের পোষ্যপুত্র; সংসারে একমাত্র উপাস্য দেবী হচ্ছেন প্রকৃতি রাণী ও একমাত্র সত্যের পুরোহিত হচ্ছেন বৈজ্ঞানিক রাজা। একথায় ধার্ম্মিকেরা প্রথমটায় ভারি ভড়কে গেল। ফলে ব্রুণোকে দিতে হ'ল প্রাণ, গালিলিওকে পাঠানো হ'ল কারাগারে ও নানা সত্যনিষ্ঠ মানুষকে, বৈজ্ঞানিককে, ধর্ম্মে অবিশ্বাসীকে heretic, blasphemer প্রভৃতি নাম দিয়ে করা হ'তে লাগ্‌ল—ভীষণ অত্যাচার।

কিন্তু এ অত্যাচার-উৎপীড়নের ফল হ'ল—যা হবার তাই:—বাধায় প্রতিহত হ'য়ে বিজ্ঞান-প্রীতির স্রোত করল শক্তি সঞ্চয় ও ধার্ম্মিকদের অসহিষ্ণুতায় ও নিষ্ঠুরতায় তিতিবিরক্ত হ'য়ে মানুষ বিজ্ঞান-দেবতাকেই একমাত্র শুভদা বরদা ব'লে বরণ করতে ছুট্‌ল। তার পরেই এল রেল, ষ্টীমার, যান্ত্রিকতা, বিদ্যুৎ প্রভৃতি নানা আবিষ্কার। তাতে বিজ্ঞানের মর্য্যাদা দশ গুণ বেড়ে গেল ও মানুষ আরও উৎসাহে শঙ্খনাদ ক'রে উঠল যে, বিজ্ঞানই হচ্ছে একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্রগ,—ধর্ম্মটর্ম্ম ওসব কিছুই নয়, একমাত্র বিজ্ঞানের পথেই মানুষের মুক্তি মিল্‌বে। নান্যঃ পন্থাঃ। ফলে বিশ্বাস হ'য়ে উঠ্‌ল—অশিক্ষিতের কুসংস্কার ও দুর্ব্বলের সান্ত্বনা। সকল বুদ্ধিমান মানুষ ভল্‌টেয়ারের সুরে সুর মিলিয়ে বল্‌তে আরম্ভ করল—যা কিছু পাবার আছে, জান্‌বার আছে, শেখ্‌বার আছে সে ঐ বুদ্ধি ও বিজ্ঞান রাজেরই কাছে লভ্য, এবং বিজ্ঞান ও বুদ্ধি যে-বিষয়ে মৌন সে বিষয়ের চর্চ্চা নিছক মূঢ়তা, সময় নষ্ট। 'যা নেই ভাবতে তা নেই ভাবতে'—আর কি। সুতরাং অতীন্দ্রিয় শক্তি, অন্ধ বিশ্বাস, রহস্যবাদ প্রভৃতিকে বিসর্জ্জন দিয়ে একমাত্র যুক্তি, বুদ্ধি, ও ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য উপলব্ধি নিয়েই ঘর কর। সাময়িক উৎসাহের উত্তাপে বিশ্বাসকে বরখাস্ত ক'রে দিয়ে একমাত্র যুক্তিকে পথসঙ্গী পেয়ে মানুষ ভাব্‌ল তার চিরদিনের পাথের বুঝি এক নিমেষে মিলে গেল।

বৈজ্ঞানিকদের আত্মপ্রসাদ বেশ ধীরে ধীরে শুক্লপক্ষের শশিকলার ন্যায় বেড়ে উঠ্‌ছিল। এমন সময়ে হঠাৎ অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ইংলণ্ডে হিউমরূপ রাহু উদয় হ'য়ে একটি ভারি অস্বস্তিকর প্রশ্ন ক'রে বস্‌লেন। তিনি বল্‌লেন, বিশ্বাসকে অন্ধ ব'লে গঙ্গাযাত্রা করাতে চাচ্ছ বেশ কথা, কিন্তু ভেবে দেখেছ কি, তোমাদের ঐ বিজ্ঞান-চর্চ্চার মূলে যেটা আছে সেটাও একটা অন্ধ বিশ্বাস ছাড়া আর কিছুই নয়? তিনি দেখালেন যে, প্রকৃতির মধ্যে বৈজ্ঞানিক-প্রবর যে-শৃঙ্খলা আবিষ্কার করতে যান সে-শৃঙ্খলাটা প্রমাণ করা যায় না, ধ'রেই নেওয়া হয়। অর্থাৎ প্রকৃতি যে শৃঙ্খলা মেনে চলেন এটাও হচ্ছে একটা বিশ্বাস মাত্র, যুক্তিসিদ্ধ তত্ত্ব নয়। বৈজ্ঞানিকেরা আজ অবধি একথার কোনো উত্তর দিতে পারেন নি। রাসেল ত তাঁর 'Is Science Superstitious?' প্রবন্ধে প্রকাশ্যেই অশ্রুপাত ক'রে বল্‌ছেন :—'The great scandals in the philosophy of science ever since the time of Hume have been causality and induction. We believe in both, but Hume made it appear that our belief is a blind faith for which no rational ground can be assigned' এর উত্তর আজ অবধি কেউই দিতে পারেন নি। তবু রাসেল আশা ছাড়ে নি। বলছেন :—'And yet in common with every one else I cannot help believing that there must be an answer......... but I am quite unable to believe that it has been found.'

আপনি বর্ত্তমান সময়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে বিশ্বাস নিয়ে এই যে সমস্যাটি উঠেছে তার খবর হয়ত পুরোপুরি নাও রাখ্‌তে পারেন। তাই বোধ হয় একটু পরিষ্কার ক'রে দেখা মন্দ নয় সমস্যাটি ঠিক্ কি— where the shoe pinches.

বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক William James-এর মন্ত্রশিষ্য, রাসেলের গুরুভ্রাতা প্রসিদ্ধ দার্শনিক গণিতবিৎ হোয়াইটহেড তাঁর 'Science and the Modern World' ও 'Religion in the Making' এ বিশ্বাস ও বুদ্ধির মধ্যে একটা আপোষে নিষ্পত্তি করতে প্রাণপণ চেষ্টা ক'রেছেন। সে সব বিশদ ভাবে ব্যাখ্যা করা এ-চিঠির সাধ্যায়ত্ত নয়। আমি শুধু তাঁর ও রাসেলের লেখা থেকে দু'-একটা যায়গা উদ্ধৃত ক'রে সমস্যাটি কি, তাই একটু পরিষ্কার ক'রে ধরার চেষ্টা পাব।

হোয়াইটহেড বল্‌ছেন :—'There can be no living science unless there is a widespread conviction in the existence of an Order of things, and in particular of an Order of Nature.'* এখন, প্রকৃতির শৃঙ্খলায় এ-বিশ্বাস যদি ভিত্তিহীন হয়, তা হ'লে বল্‌তেই হয় : 'We do not know science to be true and that it may at any moment cease to give us the control over the environment for the sake of which we like it.' † কারণ খুবই স্পষ্ট। বিজ্ঞান সম্ভব হ'য়েছে শুধু এই জন্যে যে, প্রকৃতিদেবী বিজ্ঞানের পরীক্ষায় বরাবর একই রকম ভাবে সাড়া দেবেন এটা বৈজ্ঞানিক মনে-প্রাণে বিশ্বাস করেন। কিন্তু মুস্কিল হ'য়েছে এই যে, এ-বিশ্বাসের কোনো যৌক্তিক ভিত্তিই আজ অবধি খুঁজে পাওয়া যায় নি। এ-সিদ্ধান্ত টিকে আছে probability-র ভরসায়—অর্থাৎ এতদিন যখন, পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে একই বেগে ভ্রমণ করছেন, তখন কালও করবেন। কিন্তু প্রকৃতি-শৃঙ্খলার মূল বিশ্বাসটিই যদি অসিদ্ধ

* Science and the Modern World.

† Is Science Superstitious—Bertrand Russel.

হয়, তাহ'লে theory of probability সম্বন্ধে নির্ভরসা হওয়া ছাড়া গতি কি? কাল যে বসুন্ধরা দেবী হঠাৎ থেমে যাবেন না, কে বল্‌ল? কে বল্‌ল সূর্য্যের আলোয় এতদিন সাতটা রঙ মিশে আছে ব'লে কাল পাঁচটা থাক্‌বে না ও পরশু তিনটে থাক্‌বে না? এতদিন জল ঠাণ্ডা হ'লেই বরফ হ'য়ে এসেছে বটে, কিন্তু কাল যে ঠাণ্ডা করতে গিয়ে হঠাৎ বাষ্প হবে না, এ-কথা নিশ্চিতরূপে জানি কি ক'রে? এক কথায়, অদ্যাবধি প্রকৃতিদেবী 'দৃশ্যতঃ' (apparently) নানারকম শৃঙ্খলা মেনে চলেছেন এ-কথা সত্য ব'লেই প্রমাণ হ'ল না যে, 'বস্তুত'-ও (intrinsically) তিনি শৃঙ্খলানুরাগিণী। অন্ততঃ বৈজ্ঞানিক যে যৌক্তিকতা দিয়ে একথা প্রমাণ করতে পারেন নি এটা ধ্রুব।

অথচ এ যৌক্তিক ভিত্তি প্রমাণ করতে না পারা সত্বেও বৈজ্ঞানিক প্রকৃতিকে মাপেন, গোণেন, ওজন করেন। কেন করেন? শুধু কি এইজন্যে নয় যে তাঁর মনের কোন কোনো অজ্ঞাত কারণে একটা দৃঢ় প্রতীয় বহুকাল থেকে বদ্ধমূল হ'য়ে আছে যে প্রকৃতিদেবী বিলাসিনী ললনার মত অব্যবস্থিতচিত্তা হ'তেই পারেন না—যাঁর প্রসাদোঽপি ভয়ঙ্করঃ! পৃথিবী যদি যখন-তখন যে রকম-সে-রকম গতিতে সূর্য্যকে পরিক্রমা করতেন, বিদ্যুৎ যদি যখন-তখন যে-সে-জায়গায় দেখা দিত ও অদৃশ্য হ'ত,—এক কথায়, আলো উত্তাপ প্রভৃতি যদি একটা অনির্দ্দিষ্ট বেয়াড়া খেয়ালে চল্‌ত, তাহ'লে এদের পরীক্ষা করতে যাওয়ার কি কোনো মানে হ'ত?

সুতরাং দেখ্‌তে পাচ্ছেন যে, কী অজ্ঞাত কারণে যে প্রকৃতি-দেবীর শৃঙ্খলানুরক্তিতে আমাদের আস্থা জন্মেছে সেটা আর কারুর জানা দরকার না থাকতে আরে কিন্তু বৈজ্ঞানিকের জানা চাই-ই। অর্থাৎ এ-কারণকে অজ্ঞেয় ব'লে উড়িয়ে দিলে আর যারই চলুক না কেন, তাঁর চল্‌তে

পারে না। এ-কারণকে যদি অজ্ঞেয় ব'লেই মান্‌তে হয় কেন না তাহ'লে এ সিদ্ধান্ত করা ছাড়া গতি থাকে কি—যে, বিজ্ঞানে আস্থা ও ঈশ্বরে আস্থা, প্রাকৃত-পূজা ও অতিপ্রাকৃত পূজা এ দুইই নির্ভর করছে—মাত্র একটা অন্ধ বিশ্বাসের ওপর? আর এ-সিদ্ধান্তে যে বৈজ্ঞানিকের আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান সায় দিতে পারে না, সেটা বলাই বেশী।

কাজে কাজেই, প্রকৃতির শৃঙ্খলায় বিশ্বাসকে rational বা যুক্তিসিদ্ধ প্রমাণ করতে না পারলে শুধু ভগবানকে নয় বিজ্ঞানকেও বিসর্জ্জন দিতে হয়। কিম্বা দুটোর একটা স্বীকার করতে হয়:—হয় মান্‌তে হয় যে তথা-কথিত 'চক্ষুষ্মান্' যৌক্তিকতার চেয়ে 'অন্ধ' বিশ্বাসের শ্রদ্ধেয় হবার কোনোই বাধা নেই, না হয়ে মান্‌তে হয় যে,—fundamentally—দৃপ্ত বৈজ্ঞানিকের প্রকৃতির-শৃঙ্খলায় বিশ্বাস ও দুর্ব্বলা অবলার ঈশ্বরাস্তিত্বে বিশ্বাস এ দুই-ই সমশ্রেণীর অসঙ্গতিতে ভরা। মহা মুস্কিল! বৈজ্ঞানিকেরা প'ড়ে গেছেন একেবারে 'শয়তান ও গভীর সাগরের মধ্যে'—দেখছেন? কেন না যদি মহামহিমমহিমার্ণব, বুদ্ধির-একমাত্র-ধ্রুবতারা, যুক্তিদৃপ্ত বিজ্ঞানের গোড়াপত্তনও আসলে ঐ অন্ধ বিশ্বাসেরই ওপর ব'লে মেনে নিতে হয় তবে বৈজ্ঞানিকের তথাকথিত শ্রেষ্ঠতার গর্ব্ব থাকে কোথায়? আর যদি এ বিশ্বাসকে অন্ধ ব'লে মেনে নিয়েও বিজ্ঞানের চর্চ্চা করা যায়, তাহ'লেই বা সে-আচরণের মধ্যে বৈজ্ঞানিক সঙ্গতি থাকে কোথায়? এক কথায় যুক্তিকে মান্‌লে বৈজ্ঞানিককে বিজ্ঞানচর্চ্চায় আস্থা ছাড়তে হয়, আর বিজ্ঞানচর্চ্চার মহিমা মান্‌লে যুক্তিকে ছাড়তে হয়।

এ উভয় সঙ্কটে য়ুরোপের চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক ও মনীষীরা এমন বিচলিত হ'য়ে পড়েছেন যে, তাঁদের মধ্যে একটা ব্যবধান (schism) জন্মে যাবার উপক্রম হ'য়েছে। ফলে একদল—হোয়াইটহেড, জেম্‌স,

এডিংটন, * লজের মতন—অযৌক্তিক বিশ্বাস, ধর্ম্ম, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি প্রভৃতিকে একটু শ্রদ্ধার চোখে দেখতে আরম্ভ করেছেন। ও অপর দল রাসেলের মতন এ শ্রদ্ধাকে মান্‌তে না পেরে বিলাপে ব্রতী হ'য়ে বলছেন :—The simple faith which upheld the pioneers is decaying at the centre. Outlying nations such as the Russians, the Japanese and the Young Chinese still welcome science with seventeenth-century fervour এখানে ভারতীয় নবোৎসাহীদের কথাও বলা যেত, বুঝছেন ত? "So do the bulk of the populations of the western nations" (যাঁদের মুখপাত্র হচ্ছেন ওয়েল্‌স, শ, ফ্রাঁস, গর্কি-প্রমুখ ধর্ম্মবিরাগীর দল) কিন্তু হ'লে হবে কি ?—"But the high priests begin to weary of the worship to which they are officially dedicated." এবং তার ফলে হ'য়েছে এই যে "In our day those remote from centres of culture have a reverence for science which its augurs no longer feel" (Is Science Superstitious ?).

এর ফল কি হ'য়েছে বা হ'তে যাচ্চে সেটা আমরা—ভারতবর্ষে অবশ্য এখনও ধরতে পারি নি—ধরতে সময় লাগ্‌বে। কারণ (আপনিও ব'লেছেন যে) আজ পর্য্যন্ত য়ুরোপে to-day আমাদের to-morrow-ই হ'য়ে এসেছে; (সুতরাং আমাদের to-day ছিল তাদের yesterday) বস্তুতঃ বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমাদের আজকেকার 'সবুজ উৎসাহ' হচ্ছে শুধু 'সপ্তদশ শতাব্দীর' য়ুরোপীয়ের বিকশোন্মুখ বিজ্ঞানপ্রীতির পুনরভিনয়,

* তাঁর Science and the Unseen World-এ অতীন্দ্রিয় উপলব্ধি ও বিশ্বাসের স্বপক্ষে তিনি অনেক ভাল ভাল কথা ব'লেছেন আমার একটি বন্ধু লিখেছেন। তাই বইটা আমি নিজে না পড়া সত্ত্বেও বন্ধুর নজীরে উদ্ধৃত করতে সাহসী হচ্ছি।

দুর প্রতিধ্বনি। (History repeats itself আর কি) কাজেই আজকের দিনে আমরা দেখ্‌ছি না যে, ধর্ম্মে ওদের বিশ্বাস ধীরে ধীরে ফিরে আস্‌ছে বা বিজ্ঞানের অস্বাভাবিক প্রেস্‌টিজের একটু একটু ক'রে হ্রাস হচ্ছে। রাসেলের মতে সায় দিয়ে আমিও বল্‌ছি না অবশ্য যে বিজ্ঞানের উৎসাহ গেল গেল গেল: কিন্তু এ কথা নিশ্চয় যে জড়শক্তির ও বুদ্ধি-সর্ব্বস্বতার প্রতি ওদের কালকের আস্থা আজকে বেশ একটু টলমল ক'রে উঠেছে। ওরা একটা ভারি ঘা খেয়েছে যার ফলে রাসেল সাশ্রুনেত্রে বল্‌ছেন; হায় রে হায়, শেষটায় 'most men of science in the present day'—ও কি না হয়ে উঠ্‌লেন "very willing to claim for science no more than its due?' তবু হয়ত এতেও কোনোমতে টাল সামলান যেত যদি তাঁরা সেই সঙ্গে না রাজি হ'য়ে উঠতেন 'to concede much of the claims of other conservative forces such as religion.' শেষে কি না নিরীশ্বরবাদী অন্ধপ্রকৃতির-পূজারী, বুদ্ধিদৃপ্ত বিজ্ঞানও বিশ্বাস-মাত্র-সম্বল সেকেলে conservative ধর্ম্মের দিকে ঝুঁকে পড়্‌ছে? Et tu Brute? এ দুঃখ রাখার যায়গা আছে? আপনিই বলুন।

এখানে একটা কথা আপনার কাছে ব'লে রাখি। সত্যি বল্‌ছি, ধর্ম্মের মহিমা নিয়ে অজ্ঞাতে একটু উচ্ছ্বাস প্রকাশ ক'রে ফেললেও বাগ্মিতা প্রকাশ করার কোনো গুপ্ত দুরাভিসন্ধিই আমার নেই। সে কাজ কৃষ্ণ, বুদ্ধ, খৃষ্ট, চৈতন্য, শঙ্কর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ, অরবিন্দ-প্রমুখ মহামানবদের। আমার এ চিঠির উদ্দেশ্য শুধু আপনাকে সাধ্যমত দেখাতে চেষ্টা করা যে ওদের বিজ্ঞানের ট্রাজেডিটার স্বরূপ কি? এ বক্তব্যটি পরিস্ফুট করার জন্যই এ চিঠিতে দু-একজন পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকের লেখা থেকে কয়েকটির উদ্ধৃত ক'রে দেখাতে চাই—কেমন ক'রে ওদের

মহামহোপাধ্যায়দেরও মনে ধীরে ধীরে বিশ্বাসের জোয়ার ফুলে উঠ্‌ছে। এ উদ্ধৃতির প্রয়োজন আছে এই জন্যে যে আমাদের কাছে আজ শ্বেতাঙ্গদের মতের মূল্য অত্যন্ত বেশি হ'য়ে পড়েছে। অন্ততঃ আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায়কে ভাবিত করতে হ'লে গোটা গীতা বা উপনিষদ উদ্ধৃত করলেও যে-কাজ না হবে একজন লজ বা রাসেল বা এলিস বা হোয়াইট-হেডের কয়েক লাইন উদ্ধৃত করলেও তার চেয়ে বেশি কাজ হবে। অতএব 'নারায়ণং নমস্কৃত্য' সুরু করি।

যাঁকে স্বয়ং রাসেল একজন যুগপ্রবর্ত্তক দার্শনিক-বৈজ্ঞানিক মনে করেন ও হোয়াইটহেড 'adorable genius' ব'লে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে উঠেছেন সেই বিখ্যাত মনস্বী উইলিয়ম জেম্‌সের কথা দিয়েই গৌরচন্দ্রিকা সুরু করা হয়ত মন্দ হবে না। তাঁর Varieties of Religious Experience শীর্ষক বিখ্যাত বইটি যাঁরাই প'ড়ে দেখেছেন তাঁরা জানেন তিনি দার্শনিক-বৈজ্ঞানিকদের (Scientist-philosopher) অগ্রগণ্য হওয়া সত্ত্বেও ধর্ম্মের সম্বন্ধে কেমন একটা চমৎকার শ্রদ্ধার ভাব পোষণ করতেন। উপরোক্ত বইটিতে নানা রকম ধর্ম্মোপলব্ধি সম্বন্ধে তিনি নানা মতামত প্রকাশ করেছেন। অবশ্য (য়ুরোপের অন্যান্য মনস্তত্ত্ববাদীদের মতনই) অনেক উপলব্ধিকেই তিনিও ঠিক বুঝতে পারেন নি। কেমন ক'রে পারবেন ? যা শুধু উপলব্ধিগম্য তাকে কেবল বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে গেলে গোল একটু বাধেই। * কিন্তু তবু তিনি বুদ্ধি দিয়ে ও খানিকটা

* বিখ্যাত যোগীকবি A. E. তাঁর Candle of Vision এ সত্যই বলেছেন, I think few of our psychologists have had imagination themselves... the broken water surface reflects only broken images. They see too feebly to make what they see a wonder to themselves.

অপিচ We have no words to express a thousand distinctions clear to the spiritual sense. If I tell of my exaltation to another who has not felt this himself, it is explicable to that person as the joy of perfect health, and he translates into lower terms what is the speech of the gods to men.

আংশিক অভিজ্ঞতা দিয়ে যত দূর বোঝা যায় বুঝতে আন্তরিক চেষ্টা পেয়েছেন। এবং শুধু এইটুকু সম্বল নিয়েই ধর্ম্মবিশ্বাসকে বুঝতে গিয়ে তাঁর মনে অনেকখানি শ্রদ্ধা এসেছে যে শ্রদ্ধা গড়পড়তা য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক-দার্শনিকদের মধ্যে একেবারেই মেলে না।

তাঁর শিষ্য হোয়াইটহেডের মধ্যে গুরুর এ শ্রদ্ধার অনেকখানি সংক্রামিত হ'য়েছে। তাই বিশ্বাসকে তিনি প্রথম থেকে (তাঁর গুরু ভাই রাসেলের মতন) হেসেও উড়িয়ে দেন নি বা ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সম্ভাবনায় শেষে কেঁদেও ভাসিয়ে দেন নি। এমন কি ধর্ম্মকে তিনি কেবল মানুষের one type of fundamental experiences * ব'লেই ক্ষান্ত হ'ন নি, ধর্ম্ম সম্বন্ধে লিখতে গিয়ে বেশ একটু মিস্‌টিক হ'তেও তাঁর বাধে নি। তাঁর এ উচ্ছ্বাসটুকু সযত্ন সংযম, গভীর শ্রদ্ধা ও অপরূপ কবিত্বের মধ্যে দিয়ে এত হৃদয়স্পর্শী হ'য়ে উঠেছে যে, একটু দীর্ঘ হওয়া সত্ত্বেও উদ্ধৃত করার লোভ সংবরণ করতে পারছি না। তাঁর মতে—

'Religion is the vision of something which stands beyond, behind and within the passing flux of immediate things ; something which is real and yet waiting to be realised ; something which is a remote possibility and yet the greatest of present facts ; something that gives meaning to all that passes, and yet eludes apprehension ; something whose possession is the final good and yet is beyond all reach ; something which is the ultimate ideal, and the hopeless quest.'—(Science and the Modern World).

* Science and the Modern World—Religion and Science অধ্যায়।

অবশ্য বলা বাহুল্য যে উপনিষদকার, গীতাকার, পুরাণকর্ত্তা থেকে আরম্ভ করে' কবীর, নানক, মীরা, চৈতন্য, শঙ্কর, রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ অরবিন্দ-প্রমুখ ভারতের অধিকাংশ কবি, দার্শনিক, মনীষী ও ভক্তগণ কখনো ধর্ম্মকে beyond all reach বা hopeless quest ব'লে মনে করেন নি। ভারত চিরদিন ভগবানকে 'প্রিয়তম হ'তে প্রিয়'-ই মনে ক'রে এসেছে, চিরদিনই অর্জ্জুনের ভাষায় বলতে চেয়েছে :

'পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢ়ুম্।'

'হে দেব, পিতা যেমন পুত্রকে দেখে, সখা যেমন সখাকে দেখে, প্রিয় যেমন প্রিয়াকে দেখে, তুমিও যেন আমাকে সেই চোখেই দেখ।' এবং এইখানেই হয়ত ভারতের একটা মস্ত বৈশিষ্ট্য। অন্ততঃ বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক য়ূরোপ যে ভগবানকে এতটা অন্তরঙ্গভাবে দেখতে রাজি হয় নি, একথা বোধ হয় বলা যায়। কিন্তু তা না হোক্, যায় আসে না। তাছাড়া ভারতের সঙ্গে য়ুরোপে'র তফাৎ কোথায়, সেটা নির্দ্দেশ করতে যাওয়াও এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য-বহির্ভূত। আমি হোয়াইটহেডকে উদ্ধৃত করলাম্ শুধু য়ুরোপের বিজ্ঞানজগতের অধুনাতন মতিগতি ও প্রবণতার দিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে। এবং কেবল সেই জন্যেই বক্ষ্যমাণ উদ্ধৃতিতে তাঁর ধর্ম্মকে 'পূজার্হ' বলাটাকে একটু বড় ক'রে না দেখেই পারছি না। ভাবুন ত! ধর্ম্মকে 'পূজার্হ' বলা!! আর এত বড় বিখ্যাত বৈজ্ঞানিকের পক্ষে!!!

শুনুন, তিনি কি বলছেন :—'The immediate reaction of human nature to the religious vision is worship. Religion has emerged into human experience mixed with the crudest fancies of barbaric imagination. Gradually, slowly, steadily the vision recurs in history under nobler form

and clearer expression. It is the one element in human experience which persistently shows an upward trend (সর্ব্বনেশে কথা নয়—অন্ততঃ আজকালকার প্রকৃতি-সর্ব্বস্ব,ইঙ্গবঙ্গদের কাছে? বলুন ত?) It fades and then recurs. But when it renews its force, it recurs with an added richness and purity of content (শ্রীঅরবিন্দ তাঁর যৌগিক উপলব্ধির সাক্ষে কি তাঁর Life Divine ও Synthesis of Yogaএ অগুন্তিবার এ কথা বলেন নি?) The fact of the religious vision, and its history of persistent expansion, is our one ground for optimism.'

আমাদের বিজ্ঞানোৎসাহীরা ভড়কে যাবেন না? কি মনে হয় আপনার? যদি এতেও না ভড়কান তবে হেয়াইটহেডের ব্রহ্মাস্ত্র ছাড়ি?—'Apart from religion, human life is a flash of occasional enjoyments lighting up a mass of pain and misery, a bagatelle of transient experience.'

কয়েক বৎসর হ'ল বিখ্যাত হাভেলক এলিস সাহেব একটি কবিত্বপূর্ণ দার্শনিক বই লিখেছেন, নাম "The Dance of Life." যেমন তাঁর ভাষা, তেম্নি তাঁর পাণ্ডিত্য, তেম্নি যুক্তি। বইখানি য়ুরোপে ইতিমধ্যেই অত্যন্ত প্রসিদ্ধিলাভ করেছে—শুধু বৈজ্ঞানিক-মহলে নয়—ভাবুক তরুণ-তরুণীদের মাঝেও একটা সাড়া তুলেছে।

রাসেল বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্মের একটা চিরন্তন স্বতোবিরোধ কল্পনা ক'রে কান্নাকাটি ক'রেছেন। এলিস কিন্তু (লজ, জেম্‌স্‌, হোয়াইটহেডের মতনই) ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো—মূলগত fundamental বিরোধ এমন স্বতঃসিদ্ধভাবে ধ'রে নেন নি। তিনি বরং এ বইটিতে নানাছন্দে এই সুরই গেয়েছেন যে, ধর্ম্মের প্রণোদনার (impulse) সঙ্গে বিজ্ঞানের

প্রণোদনার কোনোই সত্যিকারের বিরোধ থাক্‌তে পারে না। তিনি বলেছেন যে, এ বিরোধের উদ্ভব হ'য়েছে শুধু এইজন্তে যে, বৈজ্ঞানিকেরা চান—ধর্ম্মপ্রবৃত্তিগুলিকে শুকিয়ে (atrophy ক'রে) মেরে ফেলে শুধু বৈজ্ঞানিক প্রবৃত্তিগুলির প্রাণপণ চর্চ্চা (hypertrophy of the scientific impulses); এবং ধার্ম্মিকেরা চান—যুক্তিকে একদম বরখাস্ত ক'রে কেবল বিশ্বাস ও হৃদয়প্রবৃত্তির অনুশীলন। ফলে, শেষটায় যখন হঠাৎ বিজ্ঞানসর্ব্বস্ব অধার্ম্মিকের পাশে ধর্ম্ম-সর্ব্বস্ব অ-বৈজ্ঞানিককে দাঁড় করান হয় তখন মনে হয়, তারা যেন পৃথিবীর দুই মেরুতে দাঁড়িয়ে পরস্পরের সঙ্গে কথা কইছে। কিন্তু—এলিস বল্‌ছেন—এজন্তে দায়ী ধর্ম্মও নয়, বিজ্ঞানও নয়, দায়ী আমাদের একদেশদর্শিতা ও সঙ্কীর্ণতা। আসলে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানকে পরস্পরবিরোধী মনে করার কোনো হেতুই নেই:—

'The difficulty, we see again, has been that, on each hand, there has been a growth of non-essential traditions around the pure and vital impulse,' এবং তার ফল হ'য়েছে এই যে 'the obvious disharmoy of those two sets of accretions conceals the underlying harmony of the impulses themselves.'

(কিন্তু আমাদের দেশের বিজ্ঞানপন্থিগন ও দেশের বিজ্ঞানজগতের স্বনামধন্য আচার্য্যগণ এ ধরণের ধর্ম্মে শ্রদ্ধা দেখে কি ভারি রাগ করবেন না? আপনার কি মনে হয়? এটা জনান্তিকে।)

আর শুধু এলিসও নন, আধুনিক-বিজ্ঞান-জগতের-নিউটন সাক্ষাৎ আইনষ্টাইনও যে ব'লে ফেলেছেন এই ধরণেরই একটা কথা। জানেন বোধ হয় Alexander Moszkowski ব'লে একটি রুষ ভদ্রলোক

আইনষ্টাইনের সঙ্গে তাঁর নানা কথোপকথন লিপিবদ্ধ ক'রে ভারি একটা চমৎকার কাজ ক'রেছেন? বইটি নানাভাষায় অনূদিত হ'য়েছে। তার একস্থলে তিনি লিখছেন যে একদিন কথায় কথায় তিনি আইনষ্টাইনকে জিজ্ঞাসা করেন, নিউটন 'pious' ও 'strong of faith' ছিলেন কিনা? উত্তরে—তিনি লিখ্ছেন—

"Einstein confirmed this, and, raising his voice, he generalized from it, saying that 'in every true searcher of Nature there is a kind of religous reverence." *

আচ্ছা, বল্‌তে পারেন, এই সাদা কথাটা আমরা কেন প্রায়ই ভুলে যাই যে পূজা, বিশ্বাস, ভক্তি, শ্রদ্ধা প্রভৃতি হৃদয়বৃত্তির দ্বারা যে-সব উপলব্ধি আমাদের লাভ হয়, সে-সবের সত্য যুক্তি বা বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণও হ'তে পারে না, অপ্রমাণও হ'তে পারে না! উপলব্ধির পরখ যে উপলব্ধির কষ্টিপাথর ছাড়া অন্য কোন কিছুতেই হ'তে পারে না এ কথাটা কেন আমাদের প্রথমেই মনে হয় না? কয়েক বৎসর আগে রবীন্দ্রনাথ একটি বাউলের দুটি লাইন উদ্ধৃত ক'রেছিলেন কলিকাতায় দার্শনিক সভাপতির অভিভাষণে :—

কমলবনে কে পশিল সোনার জহুরি?
নিকষে ঘষয়ে কমল—আ মরি মরি।

ভারি চমৎকার, না? সেদিন ফরাসী আকাদেমির একজন মনীষীর কয়েকটা অনুরূপ কথা পড়তে পড়তে এই লাইন-দুটিই বারবার মনে হ'য়েছিল। আজকাল মহাত্মাদের চরিত্র ও আধ্যাত্মিকতাকে সাইকো-আনালিসিসের অভ্রান্ত (?) কষ্টিপাথরে ফেলে প্রায়ই কষে দেখার একটা ফ্যাশন উঠেছে জানেন নিশ্চয়ই? মহাত্মাদের প্রেরণা, উদ্দেশ্য, শিক্ষাদীক্ষা,

* Einstein the Searcher......৩৬ পৃষ্ঠা।

কালচার, সারবত্তা অসারতা সবই এ তুলাদণ্ডে নিক্তির ওজনে ওজন ক'রে ছেড়ে দেওয়া হচ্ছে। এ ফ্যাশানের উল্লেখ ক'রে লেখক হেসে বলছেন :—

'Et disons le en' passant : c'est un des spectacles les plus bouffons et les plus affligeants qui soient que de voir certaines mains grossieres toucher a des ames de saints. Apres tant de mesaventures pitoyables, il devrait etre entendu desormais que la saintete n'est pas du ressert de science. Il n'y a de science positive que de ce qui se compte ou de ce qui se mesure. Or on ne compte pas, on ne mesure pas l'ame des saints, ni d'ailleurs, aucune ame.' *

মনে রাখবেন, এখানে আমি ভেক-ভণ্ডের কথা বলছি না। সংসারে charlatanism, ভণ্ডামি ও জাল-জুয়াচুরি সর্ব্বত্র চিরদিনই ছিল ও (হয়ত) চিরদিনই থাকবে। বর্ত্তমান আলোচনায় সে রকম ভেল বা মেকির প্রসঙ্গ-অবান্তর। কারণ আসল সমস্যাটা ত আর ভেল বা মেকি নিয়ে নয়। ধরুন, সায়েন্সের বা আর্টের জগতেই কি ভেল মেলে না, না মেকির আগাছায় সত্য অনেক সময়েই ঢাকা প'ড়ে না? কিন্তু তাই ব'লে ত আর কেউ সায়েন্স-আর্টকে জীবনে বাতিল ক'রে দিতে চান না। তবে? কেবল বিশ্বাস বা ধর্ম্মজগতের প্রতিই বা মেকির দোহাই দিয়ে খড়্গহস্ত

* ভাবার্থ—একটা ভারি হসনীয় ব্যাপার সুরু হ'য়েছে আজকাল : কয়েকটা চাষাড়ে হাত এসে মহাপ্রাণ মানুষের অঙ্গস্পর্শ করতে আরম্ভ ক'রেছে। এ সব হাতুড়েদের নিত্য-নিয়তই পদস্খলন হচ্ছে, অথচ তবু তাঁরা বুঝবেন না যে, আধ্যাত্মিকতা সায়েন্সের এলাকার বাইরে। পসিটিভ সায়েন্স হ'তে প্যারে কেবল সেই সবের—যাকে গোণা যায়, মাপা চলে। কিন্তু মহাত্মাদের আত্মাকে না যায় গোণা, না চলে মাপা।

হ'য়ে উঠলে চল্‌বে কেন? নাস্তিকতা সব সময়ে মন্দ জিনিষ নয় মানি, কিন্তু fairness-এর অভাব সর্ব্বত্রই দূষ্য।

কিন্তু এ বুদ্ধিসর্ব্বস্ব নাস্তিকতার যুগও গত মনে হয়। মানুষ আজকের দিনে জড়বাদের সঙ্কীর্ণতা ও অতৃপ্তিকে আর একমাত্র সম্বল ক'রে চলতে চাইছে না যেন। আমি বল্‌ছি না অবশ্য যে জড়বাদের যুগ পূর্ণভাবে গত। আমার বক্তব্য—মানুষের মধ্যে একটা গভীর চেতনা জাগচে ব'লে মনে হয়। ব্যথাহত অতৃপ্ত মানুষের দৃষ্টির সাম্‌নে তার অনুভূতি যেন একটা উদ্ভাসিত নেপথ্য জগতের বারতা বহন ক'রে আন্‌ছে। আমাদের অন্তরের অন্তরতম প্রদেশ থেকে একটা উদাত্ত সুর যেন ধ্বনিত হ'য়ে উঠতে আরম্ভ ক'রেছে যে—

The intellect is not all ; a guide within
Awaits our question. He it was informed
The reason, He surpasses ; and informed
Presages of His mightiness begin.

—(Sri Aurobindo)

আর শুধু ভারতেই নয় বা শুধু হোয়াইটহেড, লজ, এলিস, আইনষ্টাইন-প্রমুখ মনীষীদের অন্তরেই নয় সর্ব্বত্রই চিন্তাশীল মানুষের হৃদয়ে একটা অশ্রুত নেপথ্য-রাগিণী থেকে থেকে বেজে উঠছে না কি? * বিশেষতঃ বিজ্ঞানের বাড়াবাড়ি একটু শান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে? অবশ্য বিজ্ঞানের প্রথম অভ্যুদয়ের যুগে নবোৎসাহের দাপটে মানুষের একটু বাড়াবাড়ি না

---

* বিলাতের মহাসমাদৃত To-day and To-morrow series-এ রাধাকৃষ্ণের Kalki-তেও নানা স্থানে এই একই কথা তিনি নির্ভয়ে ব্যক্ত করেছেন ; 'Humanity is about to take a new step forward.' 'Among the thoughtful men of every creed and country there is a note of spiritual wistfulness and expectancy.' 'Dissolution is in the air' ইত্যাদি।

ক'রেই উপায় ছিল না। এ যে তার প্রকৃতির ধর্ম্ম। সে যখন একটা কিছু ধরে চুটিয়ে ক'রে না দেখে ক্ষান্ত হয় কখনো? না, যখন যা ধরে তার শেষ অবধি না গিয়ে, শেষটায় চোরাবালিতে ঠোক্কর না খেয়ে ফিরতে পারে? কিন্তু তাই বলে ত' আর এ সাময়িক বাড়াবাড়ি, অতিচার (excess) প্রভৃতিকে চিরন্তন ক'রে দেখা চলে না। বস্তুত বিজ্ঞানের বর্ত্তমান আধিপত্য হচ্ছে মানুষের সভ্যতার বিবর্ত্তনে একটা phase মাত্র যেমন ভারতে ও য়ুরোপে একসময় সন্ন্যাসের (asceticism) প্রতিপত্তি ছিল আধ্যাত্মিক বিকাশের আর একটা সাময়িক phase. কাজেই কোনো আন্দোলনের সাময়িক প্রতিপত্তির phase-টাকেই চিরন্তন ব'লে ধ'রে নেওয়াটা ভুল। অবশ্য এটা জানি যে যখন কোনো একটা আন্দোলনের খুব বেশি প্রসার ও পসার হয় ঠিক সেই হুজুগের মাথায় তাকে তার যথার্থ perspective-এ কম লোকেই দেখতে পারে।—(যেমন বিজ্ঞানের বর্ত্তমান অভ্যুদয়ের যুগে আমরা প্রায় সকলেই প্রকৃতিদেবীকেই সর্ব্বার্থসাধিকা ব'লে স্তব করতে ছুটছি।) কিন্তু ঠিক সেই জন্যেই কি আমাদের বেশি ক'রে দায়িত্ব নেই মাথা ঠাণ্ডা রাখবার? সেইজন্যেই কি আমাদের কর্ত্তব্য নয় বেশি ক'রে মনে রাখা যে, প্রতি 'ইস্‌মের' বাড়াবাড়ি হচ্ছে ঘাড়ে ভুত-চাপার সামিল? আগেকার যুগের মানুষ তত বেশি অভিজ্ঞতা-সঞ্চয়ের সুযোগ পান নি। তাই তাঁদের এ-ধরণের ভুলচুক অনেকটা ক্ষমনীয়। কিন্তু আমরা ইতিহাস তাঁদের চেয়ে বেশি প'ড়েছি; আমরা কেন আমাদের অপেক্ষাকৃত অনভিজ্ঞ পূর্ব্বপুরুষদের মতন ভুল করব? আমাদের পিতৃপিতামহের চেয়ে যে আমরা বয়োজ্যেষ্ঠ এ কথা আমাদের স্মরণ না রাখলে চল্‌বে কেন? আসলে সন্ন্যাসই বলুন, পুরাতন পন্থাই বলুন, ভোগই বলুন বা নবপন্থী বিজ্ঞানই বলুন কোনো একটা মাত্র পথে যে চতুর্ব্বর্গ লাভ হ'তে পারে

না। এ কথা যেন আমরা না ভুলি যে—'All problems in existence are essentially problems of harmony.' *

কিন্তু যতই বলি না কেন, মুস্কিল হ'য়েছে এই যে, বিজ্ঞানের প্রেস্‌টিজের হ্রাস সবে সুরু হ'লেও এখনো শিক্ষিত মনে বিজ্ঞানের প্রভাব খুবই বেশি। এত বেশি যে, বিজ্ঞানের থিওরি, আইডিয়া, ডায়াগ্‌নোসিস্‌ প্রতিদিনই বদ্‌লানো সত্ত্বেও যেই নতুন একটা 'ইস্‌ম্‌' উঠছে সেই আমরা হাততালি দিয়ে ব'লে উঠছি—'যাঁহোক এতদিনে অবশেষে চরম সত্যটা মিল্‌ল!' বৈজ্ঞানিকদের মধ্যেও যে নানা মুনির নিত্যই নানা মত হ'য়ে থাকে এ-কথা ক্রমাগতই ভুলে গিয়ে এই দ্রুত-পরিবর্ত্তনশীল, গতিমুখর কোলাহল-কল্লোলে প্রতি নতুন স্রোতের সঙ্গেই গা ভাসিয়ে দিয়ে চ'লেছি। এর ফল হ'য়েছে এই যে চিরন্তন ব'লে যে কোনো-কিছু উপলব্ধিজগতে থাকতে পারে—যার স্পর্শে শত মালিন্য ধৌত হ'য়ে যায় ও প্রতি নবলীলা বৈচিত্র্যে মহিমময় হ'য়ে জীবনকে সমৃদ্ধি দান করে, এ বিশ্বাস ক্ষীণ হ'য়ে এসেছে। এক কথায়, আধ্যাত্মিক মনীষীর প্রতিপত্তির হ্রাস হ'য়েছে—বিজ্ঞানের সামগ্রিক সাফল্য-চটকে। কাজেই, আমরা সন্দিগ্ধ না হ'য়ে উঠেই পারি না যখন আমাদের কোনো মনীষীর মুখে শুনি যে—

'We must remember that our self-fulfilment is an integral unfolding of the divine within us in the individual soul and collective life.' †

—কেন না ইনি বার্টরাণ্ড রাসেল বা আইনষ্টাইনের মতন বিজ্ঞানের তকমা পান নি।

কাজেই আমরা ঘাড় নেড়ে দুর্ব্বোধ্য দুর্ব্বোধ্য ব'লে কলরব ক'রে উঠি, যখন শুনি যে:—

* Life Divine—Sri Aurobindo.

† Psychology of Social Development—Sri Aurobindo.

'The mind is really a reflector and a medium and none of its activities originate in themselves, none exist per sé.' *

—যেহেতু এ ধরণের কথা বিজ্ঞানসম্মত বুদ্ধির একাধিপত্য খর্ব্ব করতে করতে চায়।

কাজেই আমরা মিস্‌টিসিস্‌ম্‌, মিস্‌টিসিস্‌ম্‌ ব'লেই পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করি যখন শুনি যে :—

'Reason is only a messenger, a representative or a shadow of a greater consciousness beyond itself which does not need to reason because it is all and knows all that is' †—কেন না এ-ধরণের কথা বৈজ্ঞানিকদের বুদ্ধিসর্ব্বস্ব dogmatism-এর বিরোধী।

বৈজ্ঞানিকদের dogmatism একথা শুনলে অন্ততঃ আপনি যে রাগ করবেন না তার পরিচয় আপনার চিঠি দুটিতেই পেয়েছি। কিন্তু বিজ্ঞান-পন্থীরা করবেন নিশ্চয়ই। কেন না তাঁদের মনে একটা দৃঢ়মূল illusion আছে এই যে, বৈজ্ঞানিক মাত্রেরই মন বুঝি একটা অসাধারণ গোছের মন—যার নাম 'আশ্চর্য্য রকমের খোলা মন।'

Illusion বল্‌ছি এই জন্যে যে, বৈজ্ঞানিকেরা তাঁদের নিজেদের সর্ত্ত ও গণ্ডীর মধ্যে খানিকটা খোলা মন বজায় রাখলেও যেই নিজেদের সর্ত্তের বাইরে যেতে হয়, সে-ই তাঁরা বেঁকে বসেন। বসেন না কি? বলুন ত?

দু-একটা উদাহরণ দিয়ে কথাটা পরিষ্কার করা হয়ত মন্দ নয়। জানেন বোধ হয়, গত শতাব্দীতে বিখ্যাত রাসায়নিক Sir William Crookes (F. R. S.) Katie King-কে নিয়ে সদলবলে নানারকম

* Synthesis of Yoga—Sri Aurobindo.
† Life Divine—Sri Aurobindo.

তথাকথিত ভৌতিক এক্‌স্‌পেরিমেণ্ট করেন তাঁর ল্যাবরেটারিতে। তিনি স্পিরিচুয়ালিষ্ট ছিলেন না, তা তাঁর এ বিষয়ে রিসার্চ্চ পেপারগুলি পড়লেই দেখতে পাবেন। তিনি এ সব নানা পরীক্ষা ক'রে ইংলণ্ডের রয়াল সোসাইটিকে একটি চিঠি লিখে পাঠান। চিঠিতে লেখেন যে, ভূতে তিনি বিশ্বাস করেন না। * কিন্তু নানারকম তথাকথিত ভৌতিক পরীক্ষা ক'রেও বিশেষ ক'রে বন্ধ ল্যাবরেটারীতে Katie King-এর বার বার অবোধ্য আবির্ভাব ও অন্তর্ধানে, তার ফটো নিয়ে ও নানারকম পরীক্ষা ক'রে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌছেন যে, হোম্‌স্‌ প্রভৃতি মিডিয়ামদের মধ্যে দিয়ে এমন একটা প্রত্যক্ষ শক্তি প্রকট হ'য়ে ওঠে যার কোনো খবরই এ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান নেয় নি। তাই তিনি রয়াল সোসাইটিকে নিমন্ত্রণ করেন। বলেন, তোমরা তোমাদের দুচারজন প্রতিনিধি পাঠাও, আমার ল্যাবরেটরিতে—এ শক্তির খেলাকে প্রত্যক্ষ করতে ও পরীক্ষা করতে। †

---

* Crookes Athenœum এ লেখেন :—'এ অবধি আমি এমন কিছুই দেখি নি, যাতে আমার বিশ্বাস হ'য়েছে যে স্পিরিচুয়ালিষ্টদের থিওরি সত্য।..........................' কিন্তু তাঁর ল্যাবরেটরিতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা ক'রেই তিনি বল্‌ছেন :—'যে সব ঘটনার আমি সাক্ষী সে সবের কারণনির্দ্দেশ করতে আমি অক্ষম হলেও বাস্তব পদার্থদের নড়া-চড়া বা নানারকম শব্দ প্রভৃতি সম্বন্ধে যে-সব ঘটনা আমি স্বচক্ষে দেখেছি ও স্বকর্ণে শুনেছি সে সব যেকোনো বৈজ্ঞানিক-জানিত আইনকানুন দিয়ে ব্যাখ্যা করা যায় না এ বিষয়ে আমি ততটা নিঃসন্দেহ যতটা নিঃসন্দেহ রসায়নের নিতান্ত সাধারণ সত্য সম্বন্ধে।'

† ১৮৭১ খৃষ্টাব্দের Quarterly Journal of Science এ তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধমালা দ্রষ্টব্য। ১৫ই জুন ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি রয়াল সোসাইটিতে তাঁর এ বিষয়ে গবেষণাগুলি পাঠান ও প্রফেসর Sharpey ও Stokes কে নিমন্ত্রণ করেন তাঁর লেবরেটরিতে এসে এ সব পরীক্ষা পরখ করতে। কিন্তু এ দুটি বৈজ্ঞানিকের মন এতই 'খোলা' ছিল যে তাঁরা অতবড় বৈজ্ঞানিকের এমন সাদর নিমন্ত্রণও প্রত্যাখ্যান করেন। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানানুসন্ধিৎসা দেখছেন ত? অত বড় বৈজ্ঞানিকের পরীক্ষা দেখতে লেবরেটরিতে আমন্ত্রিত হওয়া সত্ত্বেও তাঁরা এলেন না। শুধু তাই নয়, তিনি হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেন যে 'ছমাস

ভূত বিশ্বাস করুন বা না করুন, সার উইলিয়ম ক্রুক্সের এ নিমন্ত্রণটি যে অনবদ্য, তা আপনাকে মান্‌তেই হবে। বিজ্ঞানের এলাকা হচ্ছে তথ্য সংগ্রহ, পরীক্ষা ও জ্ঞানলাভের পরিসর বাড়ানো, এবং ক্রুক্স তথ্যসংগ্রাহক হ'য়েই ভৌতিক এক্সপেরিমেণ্টের দিকে ঝুঁকেছিলেন। সুতরাং রয়াল সোসাইটির কর্ত্তব্য ছিল না কি পত্র পাঠ তাঁর কাছে তথ্যসংগ্রাহক প্রতিনিধিকে পাঠানো। কিন্তু তারা বল্‌ল কি জানেন? বল্‌ল, ও সব বাজে কাজের জন্যে লোক-টোক তারা পাঠাতে পারবে না। কিন্তু আসলে পেয়েছিল ভয়—পাছে ক্রুক্সের মতন বৈজ্ঞানিকের সঙ্গে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে পরীক্ষা করার পর তাদের বল্‌তে বাধ্য হ'তে হয় যে, তথাকথিত ভৌতিক ঘটনার মধ্যে সবই বাজে নয়। পাছে এ পরীক্ষার ফলে অতীন্দ্রিয় শক্তির সম্বন্ধে তাদের কোনো স্বীকারোক্তি করতে হয়। এই ভয়ে তারা তাঁর সঙ্গে 'বাজিনা শতহস্তেন' ব্যবহার করল! একেই কি বলে সত্যসন্ধী নির্ভীকতা? না, নিরপেক্ষ খোলা মন?

বাস্তবিক বলুন ত, এর চেয়ে গোঁড়া dogmatism-এর দৃষ্টান্ত কি ধর্ম্ম বা বিশ্বাসের ক্ষেত্রেও খুব বেশি মেলে? না, বল্‌তে চান যে সার উইলিয়াম ক্রুক্সের মতন অত বড় বৈজ্ঞানিকের এ-নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করাটা রয়াল সোসাইটির মতন ধনুর্দ্ধর বৈজ্ঞানিক সভার সদস্যদের নির্ভীক সত্যানুসন্ধিৎসার পরিচায়ক? মনে রাখবেন, ভৌতিক শক্তিকে

ধ'রে তাঁর গবেষণা সম্বন্ধে মিথ্যা ও কুৎসা ভরা প্রবন্ধ বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে নিয়মিত ভাবে চালাচালি হ'ত।' আর তাঁর অপরাধ? না, তিনি তথাকথিত ভৌতিক এক্সপেরিমেণ্ট ক'রে ব'লেছিলেন যে এমন একটা শক্তির পরিচয় তিনি পেয়েছেন বিজ্ঞান অদ্যাবধি যার খবর নেয় নি। সে সময়ে একটি প্রবন্ধে এমন কথাও লেখা হ'য়েছিল :—'আমরা বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হলাম যে, তাঁকে (ক্রুক্সকে) রয়াল সোসাইটির মেম্বর আখ্যা দেওয়া হয়েছিল বহু ইতস্ততঃ করার পরে।' আর একজন লেখেন :—তিনি রসায়নতত্ত্বেরও কিছুই জানেন না। বৈজ্ঞানিক সহিষ্ণুতা ও খোলা মন দেখুন একব'র!

মানা-না-মানার প্রশ্নই এখানে উঠ্ছে না। ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই রকম :—একজন মস্ত বৈজ্ঞানিক বল্লেন :—'আমি এমন কয়েকটি শক্তির খেলার পরিচয় পাচ্ছি যা জড়বাদের স্বীকৃত থিওরির বিরোধী।' উত্তরে গোঁড়া বৈজ্ঞানিকদল বল্লেন :—'না আমরা এরকম শক্তির অস্তিত্ব বিশ্বাস করি না।' বৈজ্ঞানিক বল্লেন, 'সে ত বেশ কথা, কিন্তু তাহ'লে এসো পরীক্ষা করে দেখা যাক সকলে মিলে—যদি আমার ল্যাবোরেটারিতে কোনো সাবধানতা অবলম্বন করতে ভুল হ'য়ে যায়, দেখিয়ে দাও, তোমাদের বৈজ্ঞানিক সহযোগিতা দাও—সত্যকে পরীক্ষা করতে।' * উত্তরে বৈজ্ঞানিক দল বল্লেন :—'আরে, যা হ'তেই পারে না ব'লে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস তা সম্ভব কি না পরীক্ষাই বা করব কেন? ও যে হ'তেই পারে না, বোঝো না হে?' † এ যদি dogmatism with a vengeance না হয়, তবে dogmatism কাকে বলে বল্বেন? এটা যে বৈজ্ঞানিকদের কত বড় অন্যায় কাজ হয়েছিল তা আজকের দিনে —যখন Psychical Research Societyর বহু পরীক্ষায় লক্ষ লক্ষ য়ুরোপীয়ের মন অতীন্দ্রিয় শক্তির সাক্ষ্যে টলমল ক'রে উঠেছে তখন—‡ অনেকেই স্বীকার করছেন।

* বস্তুতঃ ক্রুক্সের attitude ছিল অবিকল এই—তাঁর গবেষণা দ্রষ্টব্য।

† সে সময়ের বৈজ্ঞানিকদলের attitude ছিল এর চেয়েও গোঁড়ামিতে ভরা—ক্রুক্সের গবেষণা দ্রষ্টব্য। এ সব গবেষণায় তাঁর বিজ্ঞান বন্ধু দুএকজন সাক্ষী ছিলেন।

‡ যে-রাসেল কয়েক বৎসর আগেও এ সবকেই জুয়াচুরি বল্তেন—আজ সেই রাসেলই তাঁর What I believe পুস্তিকায় লিখ্তে বাধ্য হ'য়েছেন যে হাঁ। ভৌতিক পরীক্ষার অনেকগুলো বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে করা হ'য়েছে এ কথা স্বীকার করি বটে......তবে...... (হৃষ্ট হ'য়ে) তবে ওরা আত্মার অবিনশ্বরতা এখনো প্রমাণ করতে পারে নি—thank God! অবশ্য Psychical Research Society-র অনেক অনুসন্ধানে ভুলচুক আছে, অনেক ক্ষেত্রে তাঁরা প্রবঞ্চিতও হ'য়েছেন মানি। কিন্তু সে সব বাদ দিলেও যে কিছু অকাট্য সত্য তাঁরা আবিষ্কার ক'রেছেন এ কথা আজ বৈজ্ঞানিক-মহলেও স্বীকৃত হ'তে আরম্ভ ক'রেছে।

এরকম বৈজ্ঞানিক গোঁয়ারতুমির ও অসহিষ্ণু অস্বীকারের আরও অনেক দৃষ্টান্তই দেওয়া যেতে পারে। আমি এ চিঠিতে শুধু আর দুটি মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ ক'রেই ক্ষান্ত হব।

আজকের দিনে টেলিপ্যাথি বৈজ্ঞানিক মহলেও স্বীকৃত হয়েছে। এ বিষয়ে কারুরই আর সন্দেহ করার পথ নেই। কিন্তু যতদিন পথ ছিল টেলিপ্যাথির পরীক্ষাগুলিকে বৈজ্ঞানিক-মহল যে কী ভীষন বিদ্রূপ করতেন তার খবর হয়ত অনেকেই রাখেন না। তাই একটা উদাহরণ দেই। কয়েক বৎসর আগেও বিখ্যাত অধ্যাপক গিলবার্ট মারে তাঁর এ-ক্ষমতাটি হঠাৎ প্রকাশ হ'য়ে পড়ায় বড়ই লজ্জিত হ'য়ে প'ড়েছিলেন—এবং বহুদিন এ-ক্ষমতাটি গোপন রেখেছিলেন, পাছে তাঁর এ-ক্ষমতাটি বৈজ্ঞানিক-মহলে জানাজানি হ'লে তাঁকেও অলিভার লজ, সার উইলিয়াম ব্যারেট (F. R. S.), স্যার উইলিয়ম ক্রুক্‌স্‌, সার কনান ডায়লের মতন উপহসিত হ'তে হয়। বৈজ্ঞানিকরা অনেকে mob-এর অসাহিষ্ণুতা, গোঁড়ামি ও বিরুদ্ধ মতাবলম্বীকে উৎপীড়ন করার দৃশ্যে আগুন হ'য়ে ওঠেন। কিন্তু যুদ্ধের সময় যুদ্ধোৎসাহীরা যে-ধরণের উপহাস ও বিদ্রূপে শান্তিপ্রিয় মানুষের জীবন দুর্ব্বহ ক'রে তুলেছিল বৈজ্ঞানিকদের হাতে সার উইলিয়ম ক্রুক্‌স্‌, সার অলিভার লজ, সার উইলিয়ম ব্যারেট (F. R. S), সার কনান ডায়লের মতন লোকও কি তার চেয়ে কম উপহাস, ব্যঙ্গ ও গালাগালি সহ্য করেছেন? আর শুধু উপহাস? এত বড় বড় মনস্বীদের অকারণ মিথ্যাবাদী, জুয়াচোর বলতেও এই সত্যসন্ধী, সহিষ্ণু বৈজ্ঞানিকদের বাধে নি—মাত্র কয়েক বৎসর আগে। কিন্তু আজ Psychical Research Society-র মেম্বর সংখ্যা অত্যন্ত বেশি হ'য়ে পড়ায় ও নানা অতীন্দ্রিয় শক্তির সাক্ষ্য অকাট্য হ'য়ে পড়ায় শুধু sheer লোকমতের চাপে বৈজ্ঞানিকদেরা সুর একটু বদ্‌লাচ্ছে। কিন্তু তাঁদের অনুসন্ধিৎসা কি ঢের বেশি মন খোলা হওয়া উচিত ছিল না, প্রথম

থেকেই? (আচার্য্য জগদীশচন্দ্রের কাছে নিশ্চয়ই শুনেছেন তাঁর অভিনব উদ্ভিদ-তত্ত্বকে বৈজ্ঞানিকেরা কি ভীষণ গোড়ামির সহিত অস্বীকার ক'রে এসেছিল বহুদিন ধ'রে!) আর একটা মাত্র উদাহরণ দেই।

বার্গসঁর ইনটুইশনবাদ প্রচারের গোড়ার দিকে বৈজ্ঞানিকদের অসহিষ্ণুতা এতটা না হ'লেও ইনটুইশনকে জ্ঞানাহরণের পক্ষে সহায়ক বলার জন্যে তাঁকেও কম বিদ্রূপ সহ্য করতে হয় নি প্রথম প্রথম। আজকের দিনে হ্যাভেলক এলিস, আইনষ্টাইন-প্রমুখ অনেক বৈজ্ঞানিক ইনটুইশনকে বড় ক'রে দেখার ফলে য়ুরোপে ইনটুইশনবাদ আবার প্রতিষ্ঠা লাভ করতে আরম্ভ ক'রেছে বটে * কিন্তু তা সত্ত্বেও একদল বৈজ্ঞানিক ইনটুইশনের নামোচ্চারণে এখনও বিজ্ঞানসম্মত ভাবেই আগুন হ'য়ে ওঠেন। রাসেল তাঁর Philosophy in the Twentieth Century প্রবন্ধে এই সেদিনও বার্গসঁকে ব্যঙ্গ করতে ছাড়েন নি। আমার কেম্ব্রিজের একটি ইংরাজ বন্ধুর কাছে শুনেছিলাম যে সেখানকার একজন বড় বুদ্ধিবাদী বৈজ্ঞানিক বার্গসঁ সম্বন্ধে প্রায়ই ঠাট্টা ক'রে বলতেন—'Intellect is the province of human beings; intuition—that of beasts, birds and Bergson.' বার্গসঁর মতন অতবড় চিন্তাবীরের প্রতি এত বড় বৈজ্ঞানিকের (তাঁর নাম করতে পারলাম না, কেন না কথাবার্ত্তার নজীরে অনুমতি ব্যতিরেকে নামোল্লেখ করা সুষ্ঠু নয়।) এরূপ অশ্রদ্ধাপূর্ণ বিদ্রূপ প্রয়োগ করা কি উচিত? না এ রকম মনোভাব বৈজ্ঞানিক-নিরপেক্ষতা ও খোলা মনের পরাকাষ্ঠা বলতে হবে?

* হ্যাভেলক এলিস তাঁর 'Dance of Life' এ দেখিয়েছেন যে বৈজ্ঞানিকদের বড় বড় আবিষ্কারের প্রেরণা আগে তাঁরা পেয়েছেন ইনটুইশনের আলোতে, বুদ্ধি এসেছে তার পরে, এ প্রেরণাকে প্রমাণ প্রয়োগ পরীক্ষা প্রভৃতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করতে। আইনষ্টাইনও মনে করেন যে আবিষ্কারক প্রভৃতিদের পক্ষে ইনটুইশন মস্ত সহায়। (Einstein the Searcher-এ The Discoverer অধ্যায় দ্রষ্টব্য)।

এ সব দেখে শুনে বৈজ্ঞানিকদের খোলা মনের কথা শুনলে আপনার মনে হয় না সেই বিখ্যাত খোলা মন তার্কিকের কথা যিনি ব'লেছিলেন—
'I am open to conviction I bet. But I would like to see the chap who would convince me !'

বৈজ্ঞানিকরা নিজের নিজের ক্ষেত্রে খানিকটা উদার একথা মানি। কিন্তু সেটা কেবল একান্ত ভাবেই নিজের নিজের ক্ষেত্রে—এবং যাকে ইংরাজিতে বলে on their own conditions : কিন্তু যথার্থ সত্যানুসন্ধিৎসার দাবী এর চেয়ে বেশি। যথার্থ উদার সত্যানুসন্ধিৎসু অবিশ্বাস নিয়ে অগ্রসর হ'তে পারেন। (অনেক স্থলে প্রথমটা অবিশ্বাস নিয়ে এগুনো মন্দ নয়, যদিও সব চেয়ে বৈজ্ঞানিক attitude হচ্ছে বিশ্বাস অবিশ্বাস দুইকেই বর্জ্জন ক'রে খোলা মন নিয়ে এগুনো) কিন্তু তাই ব'লে নিজের সর্ত্ত দাবী করতে পারেন না। বৈজ্ঞানিকেরা বুদ্ধি বিচারের ক্ষেত্রে অনেকটা খোলা মন হ'তে পারেন দেখা যায়, কিন্তু যেই তাঁদের বলা হয় বুদ্ধিছাড়া অন্য কোনো শক্তির বিকাশ করলে একটা নতুন জগতের পরিচয় মেলে, সেই তাঁরা গোঁ ধরেন :—'সেটি হচ্ছে না।' তাঁদের মতে সে সব জগতের কোনো অস্তিত্বই 'থাকা উচিত নয়' যে সব জগতের নাগাল পেতে বুদ্ধি একান্ত অক্ষম। আর সব চেয়ে আশ্চর্য্য এই যে, তাঁরা উপলব্ধি করেন না যে এ attitude কি ভীষণ dogmatic ! ধরুন, একজন ছানিপড়া লোক যদি বলে কান দিয়ে যখন লাল নীল সাদা রঙ দেখা যায় না তখন ও-সব রঙের অনুভূতি অসিদ্ধ, তাহ'লে কি রকম শোনায় ? সে বলতে পারে কেবল এই কথা 'তোমরা বলছ ছানি কেটে দিলে রঙের অনুভূতি হয়। আচ্ছা, আমার চোখের ছানি কেটে দাও যদি তারপর এ অনুভূতির স্পর্শ পাই, তাহ'লে স্বীকার করব।' বৈজ্ঞানিকেরাও কেবল বলতে পারেন—'আচ্ছা, বুদ্ধি ছাড়া অন্য faculty আছে বলছ ?

কেন, কি উপায়ে সে faculty-র বিকাশ সাধন করা যায় ব'লে দাও, আমি সে উপায় অবলম্বন ক'রে দেখি। যদি তার পর কোনো নতুন উপলব্ধি বা অনুভূতির স্পর্শ পাই তাহলে মানব যে, বুদ্ধি ছাড়া অন্ত কোনো রিপোর্টারের রিপোর্টও বিশ্বাসযোগ্য হওয়া সম্ভব।

বলা বাহুল্য, অতীন্দ্রিয় জগতের নানা অনুভূতি-অভিজ্ঞতা-উপলব্ধির সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের attitude এতদিন ছিল এ attitude এর ঠিক্ উল্টো। এতদিন তাঁরা যা ব'লে এসেছেন, তা শুধু বলার সামিল যে 'চোখের ছানি কাটুতে আমরা রাজি নই তবে কান দিয়ে যদি লাল নীল রঙ দেখাতে পার তবে স্বীকার করতে রাজি আছি যে, এ রকম কোনো বর্ণজগতের অস্তিত্ব আছে।' সৌভাগ্যক্রমে অতীন্দ্রিয় শক্তির উপচীয়মান সাক্ষ্যে বৈজ্ঞানিকরা সম্প্রতি বুঝতে আরম্ভ ক'রেছেন যে, তাঁদের তথাকথিত বৈজ্ঞানিক attitude আসলে বেশ-একটু সঙ্কীর্ণ. অসহিষ্ণু, একদেশদর্শী। তাঁরা বোঝার কিনারায় এসেছেন যে, যদি কোনো বিশেষ অনুভব-সাধনার ফলে কোনো একটা নতুন রাজ্যের খবর মেলা সম্ভবপর হয়, তাহ'লে যথার্থ বৈজ্ঞানিকের attitude হচ্ছে—এ অনুভব-সাধনার সর্ত্ত মেনেই এ-নতুন জগতের অভিসারে চলা। কেন না, এই হচ্ছে বৈজ্ঞানিকের যথার্থ প্রেরণা—এই অদম্য জ্ঞানতৃষ্ণা; তাঁর সত্য প্রেরণা হচ্ছে জ্ঞানের পরিসরকে বিস্তৃত করার প্রেরণা—নিজের কোনা বিশেষ যুগের মতামতকে যেন তেন প্রকারেণ বজায় রাখার প্রেরণা নয়। কাজেই, বুদ্ধির কষ্টি-পাথরে যার দাগ পড়ে না, তাকে প্রথম থেকেই বাতিল ক'রে দেব এ attitude প্রশংসনীয় হ'তে পারে না। কেন না এ attitude হচ্ছে জ্ঞানের পরিপন্থী—সঙ্কীর্ণতার পরিপোষক—একদেশ-দর্শিতার সমর্থক।

অবশ্য এ attitude-এরও যে সবটাই মন্দ তা বলছি না। এর একটা ভাল দিকও আছে। এ attitude ধর্ম্ম, অতীন্দ্রিয়বাদ, বিশ্বাস প্রভৃতির জগৎকে অবিশ্বাস ক'রে চ'লেছিল ব'লে বাহ্য-জগতকেই সারাৎসার মনে

ক'রে চল্‌তে চেয়েছিল বটে এবং এর ফলে গবেষণা একটু একপেশো হ'য়ে প'ড়েছিল, এ কথাও সত্য। কিন্তু এর ফলে যে বৈজ্ঞানিকরা বাহ্যজগৎকে জড়জগৎকে একটা নতুন নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার রঙে মহিমান্বিত ক'রে তুলেছিল, একথা অবশ্য স্বীকার্য্য। এ শ্রদ্ধা, এ নিষ্ঠা, এ সাহস যে শ্রদ্ধেয় তা নিঃসন্দেহ। বস্তুতঃ জগতের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে জড়বাদ (সন্ন্যাসবাদের মতনই) একদেশদর্শী হ'লেও—অমূল্য। যেহেতু, উভয়ের কাছ থেকেই মানুষ যথেষ্ট লাভ ক'রেছে।

কিন্তু একটা আন্দোলন, মনোভাব বা সাধনার সাময়িক উপযোগিতা স্বীকার ক'রে নিয়েও বলা চলে যে, সে সাময়িক প্রয়োজনের সময় উত্তীর্ণ হ'লে সে আন্দোলনকে সম্পূর্ণতর, মহত্তর, পূর্ণতর বিকাশের মধ্যে সার্থকতা খুঁজতে হয়। যদি সে না খোঁজে তাহ'লে তার নিস্তার নেই। সে পূর্ব্বের শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম আর বজায় রাখতে পারে না, যেমন নিষ্করুণ কৃচ্ছ্রবাদ, (ascetism) বা হৃদয়হীন চার্ব্বাকবাদ (epicureanism) পারে নি।

বিজ্ঞানের আজ সেই অবস্থা। একটা পূর্ণতর পরিণতির মধ্য দিয়ে মহত্তর সার্থকতা খোঁজার তার সময় এসেছে। তাই জড়বাদের মধ্যে দিয়ে তার দান মানুষ এতদিন শ্রদ্ধার সঙ্গে গ্রহণ ক'রে এলেও বিজ্ঞানকেও তার গোঁড়ামি ও একাধিপত্যের দাবী আজ ছাড়তেই হবে। পথও খানিকটা তৈরী হ'য়ে এসেছে অবশ্য। সন্ন্যাসবাদের অতিচার, ভোগবাদের অতিচার,—সর্ব্বপ্রকার একদেশদর্শিতার অসম্পূর্ণতা সম্বন্ধে মানুষের চোখ ফুটতে আরম্ভ করেছে। সঙ্গে সঙ্গে একটা সমৃদ্ধতর জগতের আভাষ ধীরে ধীরে নিশীথের গর্ভে ঊষার প্রথম কিরণচ্ছটার মতনই মানুষের চেতনার মধ্যে তার দীপ্তি বিছিয়ে দিতে সুরু ক'রেছে। শুধু বুদ্ধি নয়, বুদ্ধির অতীত লোকের শক্তিনিচয় আজকের দিনে জগতে প্রকাশ হ'তে চাচ্ছে। বিশ্বাস, ইনটুইশন, শ্রদ্ধা এই অতীতলোকের পথের পাথের

মাত্র। এক কথায়, বৈজ্ঞানিকরা সবে একটা নতুন দীপ্ত সত্যের আভাষ পেতে সুরু করেছেন যে, এ মহত্তর জগতের পরিচয় পেতে হ'লে বিশ্বাস এমন হ'তে পারে—

'Which to the intellect may seem blind, but is in reality the cool and comforting shadow thrown by a secret light that exceeds the intellect.' *

ফলে আজ তাঁদের মধ্যে অনেকে এ-কথা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার না করলেও একটু শ্রদ্ধার সঙ্গে শুনতে বাধ্য হয়েছেন যে, 'Intuition always stands veiled behind our mental operations. Intuition brings to man those brilliant messages from the unknown which are the beginning of his higher knowledge. Reason only comes in afterwards to see what profit it can have of the shining harvest. Intuition gives us the idea of something behind and beyond all that we know and seem to be, which pursues man in contradiction of his lower reason and all his normal experience and impels him to formulate that formless perception in the more positive ideas of God, Immortality, Heaven and the rest by which we strive to express it to the mind.'—(Life Divine)'

এ ধরণের বাণীর পাশাপাশি নিন য়ুরোপের মহামনস্বী, অবিসংবাদিত প্রতিভাবান্ চিন্তাবীর রাসেলের বাণী। কি? না, I preach the will to doubt. †

* The Synthesis of Yoga—Sri Aurobindo.

† Free Thought and Official Propaganda. এবং Sceptical Essays.

এখন আপনাকেই জিজ্ঞাসা করি, এটা কি একটা 'বাণী'—message? মানুষ যে যুগ যুগ ধ'রে বর্ব্বরতার পিছুটানকে কাটিয়ে এসেছে, বার বার পড়া সত্ত্বেও অদম্য আগ্রহে বার বার উঠেছে, শত ঝঞ্ঝাঘাতেও, প্রলয়কল্লোলেও বিশ্বাস না হারিয়ে ঊর্দ্ধমুখে চেয়ে চ'লেছে—সে কি এই ধরণের কোনো বাণীর ভরসায়? য়ুরোপ জগৎকে অনেক কিছু দিয়েছে একথা অবিসংবাদিত। সাহস, প্রাণশক্তি, সত্যানুসন্ধিৎসা, বিপদবরণ, স্বাচ্ছন্দ্যত্যাগ অনেক-কিছুর জন্যেই য়ুরোপের আর্টের কাছে, সাহিত্যের কাছে, বিজ্ঞানের কাছে মানুষ চিরঋণী থাকবে। কিন্তু এ ঋণ স্বীকার ক'রেও কি বলা যায় না যে জড়বাদের উদ্ধত দর্পে, বিজ্ঞানের চমকপ্রদ কীর্ত্তিতে, ভোগের উগ্র লালসায় সে সম্প্রতি একটু দিশেহারার মতন হয়ে প'ড়েছে? এই কথাটি একটি ছোট দৃষ্টান্ত দিয়ে একটু পরিষ্কার ক'রে আজ ইতি করব।

ঘটনাটি এই:—আমাদের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিক বন্ধু স—ও বছর ফ্রান্সের বিখ্যাত চিন্তাবীর পল ভালেরির সঙ্গে এক তর্ক-সভায় উপস্থিত ছিল। ভালেরি স-কে বিশ্ব-সভ্যতায় প্রাচ্যের দান সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে বলেন। স—যা বলে তার সারমর্ম্ম এই যে, প্রাচ্য চেয়েছে বাসনা-মুক্তি, প্রতীচি চেয়েছে বাসনা-বৃদ্ধি; কিন্তু যেহেতু ইতিহাসের এখনো অনেকই বাকি আছে—সেহেতু বাসনা-বৃদ্ধিতেই শান্তি মিল্‌বে কি না সেটা 'ফলেন পরিচীয়তে।' ভালেরি উত্তরে ম্লান হেসে বলেন, 'বন্ধু, শান্তি? শান্তি কে চায়? জীবনে যে শান্তি ব'লে কোনও বস্তু লাভ করা যেতে পারে সে বিশ্বাস প্রতীচি বহুদিন হ'ল হারিয়েছে। প্রতীচি চায় এখন শুধু একটুখানি সুখ, মুহূর্ত্তের মাদকতা, এবং তার জন্যে সে প্রচুর মূল্য দিতে রাজি। এই হচ্ছে তার জীবনের বর্ত্তমান ফিলসফি।'

বস্তুতঃ নব্য য়ুরোপের নরনারীর সঙ্গে যাঁরই একটু সাক্ষাৎ পরিচয়

আছে, তিনিই জানেন তারা কী অস্থির, কী অশান্ত, কী অসুখী, কী চঞ্চল! য়ুরোপের আকাশ বাতাসের বর্ত্তমান অবস্থা যেন—

'লক্ষ্যশূন্য লক্ষ বাসনা ছুটিছে গভীর আঁধারে!'

আশা করা যাক্ এ ভাব একটা সাময়িক অবস্থা মাত্র transitional stage: কিন্তু যতদিন মানুষের সভ্যতা এ সঙ্কট উত্তীর্ণ না হয়, ততদিন কি ভারতের কর্ত্তব্য নয় তার আধ্যাত্মিকতার আদর্শকে একটা সশ্রদ্ধ trial দেওয়া?

এখানে আধ্যাত্মিকতার উদ্দেশ্য সম্বন্ধে পাঁচজনের একটু ভুল বোঝার সম্ভাবনা আছে ভেবে চিঠিটার শেষ করার আগে একটা কথা বলার দরকার বিবেচনা করছি।

কথাটা এই যে, বিজ্ঞানের কীর্ত্তিকে হেয় প্রতিপন্ন করা আধ্যাত্মিকতার অভিসন্ধি নয়। আসলে বিজ্ঞান হচ্ছে জ্ঞানাহরণ সম্বন্ধে একটা বিশেষ পদ্ধতি (এবং জ্ঞান লাভ যে সব দিক দিয়েই বাঞ্ছনীয়, একথা কে না মানবে!) তাই জান্‌তে চাওয়ার মধ্যে প্রশংসা ছাড়া আর কিছুই থাক্‌তে পারে না একথাও স্বীকার্য্য। কাজেই আধ্যাত্মিকতার প্রধান আপত্তি বিজ্ঞানের এ জ্ঞানস্পৃহা সম্বন্ধে নয়, তাঁর আপত্তি প্রথমতঃ—বিজ্ঞানের স্বাধিকার প্রমত্ত হ'য়ে অনধিকার চর্চ্চা করতে যাওয়াতে; ও দ্বিতীয়তঃ,—সব চেয়ে দর্পভরে এ দাবী জাহির করায় যে এই একটি মাত্র পদ্ধতির সাহায্যে জগতের সমস্ত বিষয়ে জ্ঞানলাভ করা সম্ভবপর। জড়-জগতে নানা বিষয় আছে—যার সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করলে জ্ঞান বাড়ে। সেখানে বিজ্ঞানের পদ্ধতি অনবদ্য। কিন্তু অনুভব-সাধনার ক্ষেত্রে, হৃদয়বৃত্তির বিকাশের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের অনড় অটল পদ্ধতি সম্যক্ ফলপ্রসূ নয়, এইটেই হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার প্রধান বক্তব্য। জড়বিজ্ঞান তার নিজের এলাকায় খোসমেজাজে বাহাল তবিয়তে বিরাজ করুন, ক্ষতি নেই—বরং লাভই তাতে ষোল আনা। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎ, প্রকৃতির শৃঙ্খলা, সমাজের

পারিপার্শ্বিকতা, স্বাস্থ্যের সর্ত্ত, আহার্য্যের উৎপাদন—এক কথায় মানুষের আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠাভূমিকে তিনি দৃঢ় করুন, এ খুব ভাল কথা। এর মস্ত প্রয়োজনও আছে নিশ্চয়ই; নইলে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের সৃষ্টি হ'ত না, জড়ের মধ্য দিয়ে চেতনার লীলাখেলা প্রকট হ'ত না। শ্রীঅরবিন্দ তাঁর 'মেটিরিয়ালিসম্' প্রবন্ধে জড়জগতে বিজ্ঞানের দান ও সেবা সম্বন্ধে উচ্চ প্রশংসাই করেছেন—মামুলি আধ্যাত্মিকতাবাদীর মতন বিজ্ঞান বা জড়বাদকে নিন্দা করেন নি। কেবল তাই ব'লে বিজ্ঞানের আবিষ্কার প্রভৃতিকে জীবনের পরম ও চরম সত্য সিদ্ধান্ত করলে ভুল হবে এই কথাই তিনি বার বার ব'লেছেন তাঁর আধ্যাত্মিক উপলব্ধির নজীরে। সম্প্রতি তিনি একটি চিঠিতে আমাকে লিখেছিলেন,—'What science calls laws of Nature are not the absolute or principal laws of existence, but only minor rules meant to build up a material basis for the life of the spirit in the body. On that has to be erected in the end, not a rule of material Law but an immortal liberty, not law of Nature, but freedom of the Spirit. The strife of forces which is regulated by these minor laws of Nature is only the battle through which man has to win the peace of the Spirit.'

বিজ্ঞানের ট্রাজিডি এই যে সে এই laws of Nature-এর কয়েকটি মাত্র আবিষ্কার করতে না করতে মদগর্ব্বে দৃপ্ত হ'য়ে ধরাকে সরা জ্ঞান করার উপক্রম।

'The Organ for the thing itself she takes
The brain for mind, the body for the soul,
Nor has she patience to explore the whole
But like a child a hasty period makes.'

—(Sri Aurobindo)

এবং তাতেও তুষ্ট না হ'য়ে তারস্বরে প্রচার করছে,—

'It is enough' she says 'I have explored
The whole of being ; nothing now remains
But to put details in and count my gains.'
So she deceives herself, denies her Lord.

—(Sri Aurobindo)

তবে আশা করা যায় তার চৈতন্য হবার জন্যে এ ট্রাজিডিরও দরকার ছিল।

আপনার চিঠির ও প্রবন্ধের আরও দু'একটি মন্তব্যের ওপর একটু আধটু মন্তব্য প্রকাশ করার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু চিঠিটি এত বড় হ'য়ে গেল যে আর বাড়ালে সম্পাদকীয় পিনালকোডের ধারায় পড়তে হবে। অতএব আজ এখানেই ইতি।

—পণ্ডিচেরী —স্নেহার্থী দিলীপ

বীরবলের পত্র। *

শ্রীদিলীপকুমার রায়,

কল্যাণীয়েষু।

তোমার খোলাচিঠির উত্তর মন খুলে লিখতে হলে, সে উত্তর বন্ধ চিঠিতেই পাঠান সঙ্গত। কারণ, লেফাফার আবডালে অনেক কথা নিঃসঙ্কোচে লেখা যায়—যা অনাবৃত পোষ্টকার্ডে লেখা চলে না। আমরা সবাই বলি যে সাহিত্যে আমরা আত্মপ্রকাশ করি—কিন্তু সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ যে ষোলআনা নিজের কথা নয়, তাও আমরা সকলেই জানি। ঐ প্রকাশের ভঙ্গীটির ভিতরেই অনেক কথা অপ্রকাশিত থেকে যায়। সাহিত্যিক মাত্রই জানেন যে, তিনি তাঁর মনের কোন্ কথাটি বলবেন ও কোন কথাটি চেপে যাবেন। নিজের বিষয় সহরে ঢাক-পেটানোর নাম সাহিত্যিক আত্মপ্রকাশ নয়।

কথাটা একটু বুঝিয়ে বলি। তোমার চিঠি পড়ে আমি খুব খুসী হয়েছি, কিন্তু কেন যে হয়েছি সে কথাটা খোলা চিঠিতে স্পষ্ট করে বলবার যো নেই, কারণ তা পড়ে পাঠকসমাজ বলবে, "দেখছ বীরবল ও দিলীপ দুজনে মিলে **Mutual Admiration Society** গড়েছে।" অবশ্য, অপরের এ কথা বলায় আমাদের বেশী কিছু আসে যায় না। কিন্তু পাঠকসমাজকে এ রকম বাজে কথা বলবার সুযোগ দেওয়া অকর্ত্তব্য কেননা, তখন তারা বক্তব্য বিষয় উপেক্ষা করে বক্তার ব্যক্তিগত চরিত্রের আলোচনা সুরু করে। Vanity আমাদের সকলেরই আছে কিন্তু সংসারের মজা এই যে, সকলেই অপরের vanity-কে হাস্যাস্পদ মনে করে। তবে

---

* উত্তরা, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৩।

খোলা চিঠির উত্তর খোলা চিঠিতেই দেওয়া দস্তুর। তাই তুমি যে বিষয়ের আলোচনা সুরু করেছ—সে বিষয়ে দু চার কথা এখন বলা যাক্।

তুমি ঠিক ধরেছ;—আমার মন বিজ্ঞান-শাসিত নয়। তা যদি হত তা'হলে আমার লেখা সম্বন্ধে বিজ্ঞ সমালোচকেরা বলতেন না যে, তা পড়ে মনে হয়, গণ্ডুষ প্রমাণ জলে "সফরী ফরফরায়তে।" অর্থাৎ আমি ছাড়া বাদবাকী লেখকেরা চিন্তা-সাগরের "অগাধ জলের মকর যেমন।" অতএব তোমার এ পত্র তাঁদেরই লেখা উচিত ছিল। তুমি যে তা করনি তার কারণ বোধ হয়; তুমি তাঁদের নাম ধাম ও ঠিকানা জান না। আমিও জানিনে।

আমি ছেলেবেলায়—বোধ হয় পাঁচ বৎসর বয়সে, যখন প্রথম বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগ পড়ি, তখন কায়ক্লেশে ক, খ, কর, খল, প্রভৃতি ধ্বনির রূপজ্ঞান লাভ করি। ক্রমে যখন আমার অক্ষর-পরিচয় শেষ হল, তখন উক্ত গ্রন্থে এই দুটি কথার সাক্ষাৎ পেলুম, "লাল জল" "কালো পাথর।" এ দুটি কথার সাক্ষাৎ লাভ করে আমার মহা আনন্দ হল। এখন ভেবে দেখি ও দুটি বাক্যের বিশেষণ দুটিই আমাকে মুগ্ধ করেছিল। অর্থাৎ যা আমার মনে আনন্দের ঘা দিয়েছিল, তা জলও নয় পাথরও নয়, তাদের রঙ। আমি আজও বিশেষণ ছাড়িয়ে কোন বিশেষ্যে সুখ পাইনে। এর থেকেই দেখতে পাচ্ছ যে আমার প্রকৃতি æsthetic, scientific নয়। কারণ Science-এর বিশ্বে জলও আছে পাথরও আছে কিন্তু রঙ নেই, কেননা ও হচ্ছে বস্তুর secondary quality। রঙ আছে মানুষের মনে, আর বিশ্বে যা আছে সে শুধু ঈথারের স্পন্দন। মানুষের মন বাদ দিয়ে যে বিশ্ব অবশিষ্ট থাকে তাই শুধু বৈজ্ঞানিকের হাতে ধরা পড়ে। বিশ্বে মন জিনিষটে নাকি প্রক্ষিপ্ত। বৈজ্ঞানিক বিশ্বের এই উপরি পাওনাটুকুই আমার কাছে বহুমূল্য, কারণ আমার বিশ্বাস, সেইটুকুই যথার্থ সত্য।

এর থেকে মনে ভেবো না যে, যাকে আমরা বৈজ্ঞানিক সত্য বলি

আমার কাছে তার কোনও মর্য্যাদা নেই। ব্যবহারিক সত্য হিসেবে বৈজ্ঞানিক সত্যই একমাত্র সত্য। এ পৃথিবীতে যে ব্যক্তি বা জাতি বেঁচে-বর্ত্তে থাকতে চায়—আর সকলেই তা চায়, তার পক্ষে বৈজ্ঞানিক সত্যের সম্যক্ জ্ঞান থাকা নিতান্ত প্রয়োজন। কারণ, কর্ম্মজীবন এ যুগে সম্পূর্ণ বিজ্ঞানের অধীন। বৈজ্ঞানিক সত্যের মহত্ত্ব তুমিও যে পূর্ণমাত্রায় স্বীকার কর, তার প্রমাণ তোমার চিঠিতে দেদার রয়েছে। বিজ্ঞান মানুষের ধর্ম্ম-বিশ্বাসের পরিপন্থী কি না তাই হচ্ছে তোমার জিজ্ঞাস্য। এ প্রশ্নের উত্তর সে-ই যথার্থ দিতে পারে, যে ব্যক্তি ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান দুটি কথারই পুরো মানে বোঝে। তুমি কি মনে কর সে শাস্ত্রজ্ঞান আমার আছে? আমি অশাস্ত্রীয় সাহিত্যিক হিসেবেই এ বিষয়ে যা মনে হয় বলছি।

তুমি দেখিয়েছ যে, এ যুগের জগৎমান্য বিজ্ঞানাচার্য্যেরা ধর্ম্মবিশ্বাসের উপর খড়্গহস্ত নন্ বরং সে বিশ্বাসের ভিত্তি যে বৈজ্ঞানিক সত্যের ভিত্তিরমত সমান দৃঢ়, এ-কথা তাঁরা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। তুমি যে সব বইয়ের উল্লেখ করেছ সে সব বই আমিও পড়েছি কিন্তু পুরো বুঝেছি কিনা বল্‌তে পারি নে। এমন কি, ও-সব বই আমি যে কিছুমাত্র বুঝতে পারি এ-কথা কোন M. Sc. স্বীকার করবেন না। তৎসত্ত্বেও যে পড়েছি, তার প্রথম কারণ, যে অজ্ঞ তারই কৌতূহল বেশি, তা ছাড়া যাঁরা বুঝতে পারেন, তাঁরা যখন তা পড়েন না, তখন যে না বোঝে তার পড়া ছাড়া উপায়ান্তর নেই। Eddington, Whitehead প্রভৃতির লেখা থেকে আমি মোদ্দা কথা এই বুঝেছি যে উনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান বিলকুল জ্ঞানের রাজ্য জবর-দখল করে নিতে যে চেষ্টা করেছিল—বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকরা সে চেষ্টাকে গোঁয়ার্ত্তুমি মনে করেন এবং এ-যুগের বিজ্ঞান, ধর্ম্মের সঙ্গে আপোষে জ্ঞানরাজ্যে ভাগ-বাটোয়ারা করে নিতে শুধু প্রস্তুত নয়, নিতান্ত উৎসুক।

এ ব্যাপারে একমাত্র বৈজ্ঞানিক যিনি মহা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন, তিনি হচ্ছেন তোমার ভূতপূর্ব্ব গুরু Bertrand Russell। এতে আর যিনিই আশ্চর্য্য হন্, আমি হই নি। কেন? তা বলছি। তুমি ও তোমার সমবয়স্ক বন্ধুরা যখন Russell-এর নাম ভক্তি গদগদ কণ্ঠে উচ্চারণ করতে, তখনও আমি তাঁর সকল কথা বেদবাক্য বলে মেনে নিতে পারি নি, যদিচ আমি লেখক হিসেবে তাঁর মহা admirer। Russell চমৎকার লেখক উপরন্তু অতিশয় চতুর লেখক। তাঁর বুদ্ধি খোলা তলোয়ারের মত তীক্ষ্ণ এবং উজ্জ্বল। *নির্ব্বুদ্ধিতার এমন মারাত্মক শত্রু ইংলণ্ডে আর দ্বিতীয় নেই। তাঁর দার্শনিক মতামত নয়, তাঁর লেখার æsthetic ও emotional quality-ই আমাকে মুগ্ধ করে। তবে আমার মনে হয় Russell একটা গোড়ায় গলদ্ করেছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে ইংলণ্ডে জন্ম গ্রহণ না করে, তিনি যদি অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফ্রান্সে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে তিনি শ্রীমতী Reason মহাদেবীর Salon-তে অর্থাৎ রঙ্গমন্দিরে Voltaire, Diderot-প্রমুখ নবরত্নের মধ্যে হীরের টুকরো বলে গণ্য হতেন। কারণ, তাঁর মনে রঙ নেই, আছে শুধু জলুস্।

আমার এ অনুমান যে অলীক নয় তা তুমি Russell-এর যে কটি কথা তোমার পত্রে উদ্ধৃত করেছ তার থেকেই প্রমাণ হয়।

তিনি বলেছেন যে—

"The high priests begin to weary of the worship to which they are officially dedicated.

In our day those remote from centres of culture have a reverence for science, which its augurs no longer feel."

বিজ্ঞান যে রাসেলের মতে একরকম ধর্ম্ম তা তাঁর ব্যবহৃত worship, reverence প্রভৃতি কথাগুলি থেকেই বোঝা যায়। যে ধর্ম্ম পৃথিবীতে অদ্বিতীয় ধর্ম্ম, সে ধর্ম্মের প্রভাব ও প্রতিপত্তি যে তার জন্মস্থানে কমে যাচ্ছে

রাসেলের ন্যায় বিজ্ঞানের ঐকান্তিক ভক্তের এ দুঃখ রাখবার আর স্থান থাকৃত না, যদি না তিনি প্রমাণ পেতেন যে জ্ঞানরাজ্যের বহির্ভূত দেশের লোকেরা এ ধর্ম্মের দশাপ্রাপ্ত ভক্ত হয়ে উঠেছে।

এই অশিক্ষিত ও অর্দ্ধশিক্ষিত ভক্তরা কারা? রাসেল তাদেরও চিনিয়ে দিয়েছেন।

"Outlying nations such as the Russians, the Japanese and the Young Chinese still welcome Science with Seventeenth Century fervour."

ছোটনাগপুরের মুণ্ডা ও কোল এবং মাদ্রাজের পঞ্চমরা খৃষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত হচ্ছে দেখে মিশনারীরা যে রকম আহ্লাদে আটখানা হন, রাসেলও রুশ, চীন, জাপানীরা বিজ্ঞানের ধর্ম্মে convert হয়েছে দেখে তেমনি প্রফুল্ল হয়েছেন।

কাঁচা মনের গুণই এই যে, সকল রকম নব ধর্ম্মের ছাপ তাতে সহজে এঁটে বসে। এর পরিচয় সংস্কৃত সাহিত্যেও পাওয়া যায়।

ক্ষেমেন্দ্রের "সময়-মাতৃকা" নামক কাব্য পড়েছ? যদি না পড়ে থাক ত নির্ণয়-সাগর প্রেস থেকে আনিয়ে সেখানি পড়ে দেখো। ক্ষেমেন্দ্র নিজে ছিলেন বৌদ্ধ কিন্তু তাঁর যুগে ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রভাব লুপ্তপ্রায় হয়ে এসেছিল। এই সময়ে জনৈক বৃদ্ধা বেশ্যা বৌদ্ধ-ভিক্ষুণী হয়ে মহাচীনে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের কার্য্যে ব্রতী হলেন। তাঁর প্রচারের ফলে মঙ্গল-জাতির কি অবস্থা হয়েছিল, জানো?—"শুস্কা তুরুস্কা চিনা প্রলীনা"। এ হচ্ছে ক্ষেমেন্দ্রের কথা—আমার বানানো নয়। সুতরাং এ যুগে যে ধর্ম্মের বিলেতে জন্ম, সে বাসি ধর্ম্মের প্রভাবে যে তুরুস্কা শুস্কা ও চীনা প্রলীনা হয়ে পড়বে এতে আর আশ্চর্য্য কি?—History repeats itself।

তবে বিংশ শতাব্দীর চীন জাপান রুশিয়া ইউরোপের সপ্তদশ শতাব্দীর জুড়ি কি না সে বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে। এদের Science

এর প্রতি ভক্তি যতই অচলা হোক না কেন, জাপানে যে দ্বিতীয় Descartes-এর, বা চীনদেশে নূতন Newton-এর আবির্ভাব হয়েছে কি হবে, এ রকম মনে করবার কোনই কারণ নেই। ও দুটি জ্ঞানরাজ্যের মহাপুরুষ পুরোনো Religion-কে খেদিয়ে Science-কে নব Religion করে তোলেন নি।

ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের যে দা-কুমড়োর সম্পর্ক, এ জ্ঞান দেকার্ত্তেরও ছিল না, নিউটনেরও ছিল না। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগেই এ লড়াই সুরু হয় এবং ঊনবিংশ শতাব্দীতেই Science মানুষের মনোরাজ্যে তার একাধিপত্য লাভ করে। রাসেলের মন হচ্ছে অষ্টাদশ শতাব্দীর ছাঁচে গড়া, তাই তিনি আজও বিজ্ঞানের die-hard conservative-দের মত মনোরাজ্যে বিজ্ঞানের imperialism বাজায় রাখবার জন্য অধীর হয়ে মারো কাটো বলে চীৎকার করছেন, বিশেষতঃ যখন বিজ্ঞানের High-priest-রাও ধর্ম্মে আস্থাহীন হয়ে পড়েছেন। এ যুগের বিজ্ঞানাচার্য্যদের মধ্যে রাসেলই বোধ হয় একমাত্র নিরঙ্কুশ materialist, সুতরাং তিনি রুশ তুরস্ক চীন জাপানে তাঁর মনোমত চেলা আবিষ্কার করেছেন—এবং সেই চেলাদের সাহায্যে বিজ্ঞানের একচ্ছত্র রাজ্য-প্রতিষ্ঠা করবার আশা করছেন। Shakespeare বলেছেন:—Adversity makes us acquainted with strange bed-fellows.

চীন জাপানের বৈজ্ঞানিক হিসেবে হঠাৎ—প্রবুদ্ধ লোকেরা আজও বৈজ্ঞানিক materialism সম্বন্ধে নেতি, নেতি বলতে শেখে নি, এই কারণেই বোধ হয় রাসেল মনে করেন যে তাদের বিজ্ঞান-ভক্তির উপর কোনরূপ সংশয়ের ছায়া পড়বে না। তিনি ভুলে গেছেন যে বিজ্ঞান শুধু জ্ঞানমার্গের বিষয় নয়, কর্ম্মমার্গেরও বিষয় এবং কর্ম্মমার্গের অদ্বিতীয় শক্তি বলেই বহু লোকের কাছে জ্ঞানমার্গেরও terminus বলে গ্রাহ্য হয়েছে।

যোগ যে "কর্ম্মসু কৌশলং" এ কথা এ দেশেরই কথা। কর্ম্মের আর বহুরূপ কৌশল আছে বৈজ্ঞানিক কৌশলের তুলনায় সে সব নগণ্য। মন্ত্র তন্ত্রের চাইতে যন্ত্রের শক্তি যে লক্ষগুণে বেশি তা কে জানে। বিজ্ঞান এ যুগের white magic, সে magic আমরা সকলেই শিখতে চাই। "যা দেবী সর্ব্বভূতেষু বুদ্ধিরূপেণ সংস্থিতা" তাঁর কাছে "ধনং দেহি মানং দেহি" বলে আবদার ধরতে আমরা সবাই প্রস্তুত। পৃথিবীর যে সকল জাতি কর্ম্মক্ষেত্রে ইউরোপের কাছে পরাস্থ হয়েছে, তারা যে কায়মনো-বাক্যে এ যোগ-সাধনা করবার চেষ্টা করবে, এ ত ধরা কথা। যে কৌশলের বলে ইউরোপ এসিয়ার ঘাড়ে চড়ে বসেছে, এসিয়ার লোক যে সে কৌশল এস্তমাল করবার চেষ্টা করবে এও ত নিতান্ত স্বাভাবিক। সুতরাং Russell যাদের স্বল্পশিক্ষিত বলে অবজ্ঞা করেন, তারা যে বৈজ্ঞানিক Metaphysics নিয়ে মাথা বকায় তা ত মনে হয় না, জীবন-যাত্রার অমোঘ অস্ত্র বলে বিজ্ঞান তাদের কাছে মান্য!

তা ছাড়া বাহ্যদর্শীদের আছে Physics-ই যে আসল Metaphysics এ কথা সহজে গ্রাহ্য হয়। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকই বাহ্যদর্শী ইউরোপেও, এসিয়াতেও। সুতরাং Physics-এর বাইরে আর কিছু জানবার তাদের প্রবৃত্তিও নেই। এ হিসেবে, কর্ম্মভোগের ভোগীরা বৈজ্ঞানিক দর্শনকে পরাবিদ্যা বলে ততদিন মান্‌বে যতদিন তাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত না হয়। আর এক কথা ইউরোপের প্রভাবে এসিয়ায় moral materialism ঢের বেড়ে গিয়েছে। আর philosophical materialism যে moral materialism-এর পৃষ্ঠপোষক, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। "যাবজ্জীবেৎ সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ"—এ নৈতিক উপদেশ চার্ব্বাক্ স্ফূর্ত্তি করে দিতে পারতেন না যদি philosophical materialism-এর ভিৎ তিনি পত্তন না করতেন।

তুমি বলেছ—আমাদের দেশেরও নবশিক্ষিত সম্প্রদায়ও চীনে-

জাপানীদের মত বৈজ্ঞানিক দর্শনের প্রভাবে অভিভূত হয়ে পড়েছে। খুব সম্ভবতঃ তাই হয়েছে—কারণ আমরাও centre of culture থেকে অনেক দূরে পড়ে আছি। তবে আমাদের নবশিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন যে কোন্ জাতীয় তা বলা কঠিন। আমি ত সে মনের কোন স্পষ্ট চেহারা দেখতে পাই নে। সম্ভবতঃ সে মন এখন solution-এর অবস্থায় আছে, পরে crystallised হয়ে পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করবে। তখন দেখা যাবে, ভারতবর্ষের নব-মন বিলেতে গড়া কি না?

অবশ্য আমাদের পলিটিকাল গুরুদের কথায় মনে হয়, তাঁরা সকলে বৃহস্পতির মত গ্রহণ করেছেন কিন্তু চার্ব্বাকের দর্শন প্রচার করবার মত বুকের পাটা কারও নেই। চার্ব্বাক্‌কেও বুঝতে পারি শঙ্করকেও বুঝতে পারি এবং দুজনকেই সমান শ্রদ্ধা করি। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে যাঁদের মন হরিশ্চন্দ্রের মত শূন্যে ঝুলছে তাঁদের মত আমার কাছে নগণ্য, কারণ যাঁদের মনের স্থিরতা নেই তাঁদের আবার মতের দৃঢ়তা কোথায়?

প্রমথ চৌধুরী কিছুদিন পূর্ব্বে 'বিচিত্রা'য় যে প্রবন্ধ লিখেছিলেন তার এক জায়গায় আছে যে—I believe এবং I don't believe দুইই মানুষের মত কথা—দুইই spiritual freedom-এর পরিচায়ক। মনোজগতের কাপুরুষরাই শুধু "না যযৌ না তস্থৌ" অবস্থায় বিরাজ করে। এ বিষয়ে আমি প্রমথ চৌধুরীর সঙ্গে একমত। নপুংসক মন আমার æsthetic sense তুষ্ট করে না। Bertrand Russell-কে আমি মান্য করি এই জন্য যে যদিচ তিনি মুখে scepticism প্রচার করেন তবুও তাঁর তুল্য ঘোর dogmatic ইংলণ্ডে দ্বিতীয় নেই।

তুমি বলেছ, বিজ্ঞান, মনোজগতের অনেক জঙ্গল পরিষ্কার করেছে—এ অতি সত্য কথা। আমাদের দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মন আজও আগাছায় ভরা। আর সে কাঁটাবন যদি আমরা পরিষ্কার করতে উদ্যত হই, তখনই তাঁরা এই বলে চীৎকার করে ওঠেন যে, তাঁদের মনের

ফুলবাগান উজাড় করবার উদ্দেশ্যে আমরা লেখনী ধারণ করেছি। এ সম্প্রদায় morally materialistic হতে পারে কিন্তু তাঁদের অন্তরে scientific temper জন্মায় নি।

এ শ্রেণীর লোক যখন বলেন যে তাঁরা ধর্ম্মে বিশ্বাস করতে পারেন না, তখন আমি বলি, বাচুং! কারণ তাঁরা বিশ্বস্ত হলেই, হয় কালীঘাটে জোড়া-পাঁঠা মানত করবেন, নয় পীরের ছিন্নি দেবেন। তবে তুমি যে ধর্ম্মের সঙ্গে Science-এর বিবাদের কথা তুলেছ এটা নিতান্ত সময়োপযোগী হয়েছে। তোমার পিতৃদেব বহুকাল পূর্ব্বে দেশের লোককে বলেছিলেন "আবার তোরা মানুষ হ"। এ দেশের ইংরাজী-শিক্ষিত লোকদের আবার যদি মানুষ হতে হয় তাহলে এ সমস্যা তারা এড়িয়ে যেতে পারবে না। কোন সমস্যাকেই ফাঁকি দিয়ে মানুষ হওয়া যায় না।

ধর্ম্মবিশ্বাসের সঙ্গে Science-এর যে বিবাদ আছে এ কথা অস্বীকার করে তার মীমাংসা করা যায় না। যেমন আমাদের দেশের পলিটিক্সে হিন্দু-মুসলমানের যে বিরোধ স্পষ্ট, সে বিরোধ নেই বল্লেই উভয় সম্প্রদায়ের গলাগলি হয় না।

আমরা যারা ধর্ম্মবিশ্বাসকেও বাতিল করতে পারি নে, Science-কেও উড়িয়ে দিতে দিতে পারি নে, আমাদের পক্ষেও এ বিবাদটা কি ও কতদূর সঙ্গত, তা ভাবতেই হবে—কেননা আমাদের অন্তরেই ধর্ম্মবিশ্বাস ও scientific বিশ্বাস পাশাপাশি বাস করছে এবং পরস্পর জ্ঞাতি শত্রুতা করছে। এ উভয়ের সন্ধি-স্থাপন না করতে পারলে, মনোজগতে শান্তি-স্থাপন হবে না। Whitehead-প্রমুখ বিজ্ঞানাচার্য্যেরা এই সন্ধির প্রস্তাবই করেছেন, শুধু রাসেল বলছেন "যুধ্যস্ব"।

আমার বিশ্বাস ধর্ম্মের ভিতর যেটুকু science আছে তারই সঙ্গে Science-এর বিরোধ এবং Science যে-ক্ষেত্রে Religion হয়ে ওঠে সেই ক্ষেত্রেই Religion-এর সঙ্গে তার মাথা-ঠোকাঠুকি আরম্ভ হয়। সূর্য্য

পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করলেই যে তা হয় ভগবানের সৃষ্টি, আর পৃথিবী সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করলেই যে তা অনাসৃষ্টি, এ কথা তুমিও বিশ্বাস কর না, আমিও বিশ্বাস করি নে। কিন্তু এই ঘোরাঘুরির হদিস পেলেই যে আমাদের আত্মা পূর্ণ চরিতার্থতা লাভ করে, তাও নয়। ধর্ম্মবুদ্ধি হচ্ছে মনের সেই শক্তি, যা Science-এর অতিরিক্ত সত্যের সাক্ষাৎ পায়। এ শক্তিতে আমরা বিশ্বাস করতে বাধ্য—কেননা এ শক্তি যদি না থাকত, তা হলে শুধু ধর্ম্ম কেন আর্টেরও কোন অর্থ থাকত না। আমি বলেছি যে, আমার মনের ধাত æsthetic সুতরাং পৃথিবী থেকে ধর্ম্ম যাবে, আর্ট যাবে, কাব্য যাবে,—আর থাকবে শুধু অন্ন ও বস্ত্র। এ কথা মনে করতেও আমার আতঙ্ক হয়। ভরসা এইটুকু—এ বিশ্ব যে মূলতঃ spiritual, এ কথা Science-এর High priest-রাও স্বীকার করতে আরম্ভ করেছেন।

Spirit-কে মাপবার কোনও গজ নেই, ওজন করবার কোনও দাঁড়িপাল্লা নেই, অপর পক্ষে পরমাণুকে মাপবার ও ওজন করবার যন্ত্র আছে। সুতরাং যাঁরা weights and measures-কেই সার সত্য মনে করেন, তাঁদের কাছে আত্মাও নদারৎ, পরমাত্মাও নদারৎ। আছে শুধু Matter ও Motion; কেননা, Matter ওজন করা যায় ও Motion মাপা যায়। তবে নব Physics নাকি আবিষ্কার করেছে যে, পুরোনো মাপজোক সব একটু আধটু ভুল। কিন্তু বিজ্ঞানশাস্ত্রে একটুখানির মূল্য অনেকখানি, সত্যেরও, মিথ্যারও। বিশ্বের উঠোন বাঁকা আর Electron-এর নৃত্য বেতালা, এই আবিষ্কার করে, নব-বৈজ্ঞানিক মহলে একটু চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়েছে।

উর্দ্দূতে একটি কথা আছে, "যব্ দিয়া রঞ্জ বুতোঁনে, তব খোদা ইয়াদ আয়া" এর অর্থ মাটির পুতুল যখন ফাঁকি দেয়, তখন খোদার কথা মনে পড়ে। বিজ্ঞানের মাটির পুতুল এখন বৈজ্ঞানিকদের মনগড়া

পুতুল বলে ধরা পড়েছে বলে বোধ হয় তাঁদের ধর্ম্মবুদ্ধি আবার সজাগ হয়েছে।

যারা অবৈজ্ঞানিক হিসেবে জানে যে পায়ের নীচে মাটিও আছে আর মাথার উপরে আকাশও আছে তাদের পক্ষে এইটেই সু-খবর যে, বৈজ্ঞানিকরা এখন সুধু "মাটি ছাড়া কিছু জানবার নেই"—এমন কথা আর জোরকরে বলছেন না, আকাশের দিকে চাওয়াকেও আর মূর্খতা বলে অবজ্ঞা করছেন না। রাসেল সুধু **Matter** নেই স্বীকার করেও **materialism** প্রচার করছেন। এ কি রকম ব্যাপার জানো, **Nation** না থাক্‌লেও **nationalism**-এর মত। এ জাতীয় **ism**-এর মেজাজ বড় কড়া সুতরাং তার গায়ে হাত দিতে ভয় হয়।

তুমি যে আলোচনা শুরু করেছ আর আমাকেও যাতে যোগ দিতে বাধ্য করেছ, সে বিষয়ে অনেকের মতে আমাদের মুখ খোলবারই অধিকার নেই। এ-হেন পণ্ডিতের তর্ক নাকি তাঁদের মুখেই শোভা পায় যাঁরা হয় ধর্ম্মের **expert**, নয় বিজ্ঞানের **expert**। এর কোন শাস্ত্রের শাস্ত্রী আমি ত নইই এবং সম্ভবতঃ তুমিও নও। সুতরাং এ ক্ষেত্রে কেন যে অনধিকার চর্চ্চা করছি তার কৈফিয়ৎ দেওয়া দরকার—কেননা এ চিঠি খোলা চিঠি।

পণ্ডিতের তর্কের সেখানেই সার্থকতা আছে যেখানে অ-পণ্ডিত সহৃদয় লোক সে তর্কের মর্ম্ম বোঝে, নচেৎ সে হয় শুধু ব্যাকরণের কচকচি। ভুলে যেয়ো না যে **Science**-এরও ব্যাকরণ আছে, **Religion**-এরও ব্যাকরণ আছে। যারা ধর্ম্মেরও বৈয়াকরণ নয়, বিজ্ঞানেরও বৈয়াকরণ নয়, তাদেরই ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের বিরহ মিলনের পালা শোনবার সম্পূর্ণ অধিকার আছে—যদি এ দুই পক্ষের অধিকারীরা ভাষায় কথা কন। কারণ, ভাষা জিনিষটে হচ্ছে সর্ব্বসামান্য—যা থেকে ভাষার উৎপত্তি অর্থাৎ মন, তা পণ্ডিতেরও আছে অ-পণ্ডিতেরও আছে। এই কারণে পণ্ডিতরা যা

নিয়ে তর্ক করেন—তার মূল আমাদের সকলেরই অন্তরে নিহিত। আমরা intuition-কেও মন থেকে ছেঁটে দিতে চাইনে reasoning-কেও গলাধাক্কা দিতে পারি নে, সংসারে আমাদের এ দুয়েরই হাত ধরে চল্‌তে হবে। কাযেই, তোমার আমার মত যারা মনের কারবার করে তারা ধর্ম্মবিশ্বাসকেও উড়িয়ে দিতে পারবে না, Science-এও অবিশ্বাসী হতে পারবে না। যাঁদের মনে ধর্ম্মেও বিশ্বাস নেই Science-এও বিশ্বাস নেই—যেমন আমাদের ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায়ের—তাঁরাই বল্‌বেন এ সব বাজে তর্ক। কিন্তু যাঁরা মনে আমাদের স্বজাতি, তাঁরা আমাদের কথা হেসে উড়িয়ে দেবেন না। এই ভরসাতেই এ চিঠি লেখা। ইতি—

১২।১২।২৯—কলিকাতা— —বীরবল

ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান।*

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত

(১)

শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী, শ্রদ্ধাস্পদেষু—

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায় আপনার বীরবলী প্রকাশকে সম্বোধন ক'রে যে চিঠি লিখেছেন (১), আর আপনি তার যে জবাব পাঠিয়েছেন (২) তার শেষে এ কথা লিখে দেন নি যে এ সম্বন্ধে আর বাদানুবাদ আপনারা শুনতে চান না। সুতরাং ভরসা ক'রে আমিও একখানা খোলা-চিঠি আপনাকে পাঠাচ্ছি। কারণ, আপনাদের দুই চিঠিতে আপনারা যে বিষয়ের আলোচনা করেছেন ইউরোপের বিজ্ঞানবিদ্ দার্শনিক মহলে তা নিয়ে আজকাল খুব বিচার চলেছে। এ সম্বন্ধে বহু পাণ্ডিত যে বহু পুঁথি লিখ্‌ছেন তা দিলীপকুমারের চিঠির নামের লিষ্ট ও কোটেশনের বর্দ্দেই বোঝা যায়। এই সব পুঁথির দু' একখানা পড়্‌তে পেয়েছি এবং এ বিচারের বিষয়ে দু'চার কথা বলার লোভ মনে জমা ছিল। আপনাদের চিঠি প'ড়ে সে লোভ সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হ'ল।

দিলীপকুমার তাঁর চিঠিতে বিলাতী পাণ্ডিতদের বহু বচন তুলে প্রমাণ করেছেন যে অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান জ্ঞানরাজ্যের যেসব জায়গা জবরদখল করেছিল, বিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিকেরা না-দাবী পত্র লিখে দিয়ে সে-সব জায়গা তাদের প্রকৃত অধিকারীদের ফিরিয়ে দিচ্ছেন।

---

* বিচিত্রা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭।

(১) উত্তরা, কার্ত্তিক, ১৩৩৬।

(২) উত্তরা, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৬।

পণ্ডিতদের কথার এই যে নির্গলিতার্থ তা আপনিও বলেছেন। বিজ্ঞান যে-সব জায়গায় অনধিকারপ্রবেশ করেছিল এবং এখন যেখান থেকে সাধুসজ্জনের মত বেরিয়ে আসছে তা যে প্রধানতঃ ধর্ম্মের স্বস্থান এইটি দেখানই দিলীপকুমারের চিঠির উদ্দেশ্য। কথাটা একটু খুঁটিয়ে দেখা ভাল। আধুনিক বিজ্ঞানের তার লীলাভূমিতে প্রচলিত ধর্ম্মের সঙ্গে খুব বড় রকমের সংঘর্ষ ঘটেছে দুইবার। প্রথম খৃষ্টীয় সপ্তদশ শতকের প্রারম্ভে, আধুনিক বিজ্ঞানের শৈশবসময়ে। দ্বিতীয়বার উনবিংশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি, আধুনিক বিজ্ঞানের যখন পূর্ণযৌবন। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দের ২৪শে ফেব্রুয়ারী তারিখে পোপের ধর্ম্মতত্ত্বে পরামর্শদাতা আচার্য্যেরা স্থির করলেন যে সূর্য্য জগতের কেন্দ্রস্থলে নিশ্চল অবস্থিত এবং পৃথিবীর একটা আহ্নিক আবর্ত্তনগতি আছে;—এর প্রথম সিদ্ধান্তটি তত্ত্ব হিসাবে হাস্যকর এবং ধর্ম্মের দিক থেকে নাস্তিকতা, কারণ, বাইবেলের বিরোধী; এবং দ্বিতীয় সিদ্ধান্তটি তত্ত্ব হিসাবে প্রথমটিরই সমকক্ষ এবং ধর্ম্মবিশ্বাসের দিক থেকে অন্ততঃ পক্ষে ভ্রমাত্মক। এর দুইদিন পরে পোপের আদেশে গ্যালিলিওকে আহ্বান ক'রে সাবধান ক'রে দেওয়া হ'ল যেন ঐ নাস্তিক মতবাদ তিনি অতঃপর পোষণ, প্রচার ও সমর্থন না করেন। ৫ই মার্চ্চ তারিখে কোপর্নিকাসের গ্রহ-গতি সম্বন্ধে বিখ্যাত গ্রন্থের প্রচার-বন্ধের ফতোয়া জারী হ'ল। উনবিংশ শতাব্দীতে ভূতত্ত্ববিদ্ ও জীবতত্ত্ববিদ্ বৈজ্ঞানিকেরা সিদ্ধান্ত করলেন যে এই পৃথিবী বহু লক্ষ বৎসরের প্রাচীন সৃষ্টি, এবং বহু পরিবর্ত্তনের মধ্যদিয়ে এর জল-স্থল তাদের বর্ত্তমান আকার ও রূপ পেয়েছে। আজকের পৃথিবীতে যে-সব জীবজন্তু ও বৃক্ষলতা দেখা যায় সে রকমের জীবজন্তু ও বৃক্ষলতা প্রথমাবধিই পৃথিবীতে ছিল না। সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের সব জীব ও উদ্ভিদ পূর্ব্বে পৃথিবীতে ছিল, এবং বহু লক্ষ বৎসর ধ'রে ক্রমশঃ পরিবর্ত্তিত হ'য়ে সেই সব রকমের জীব ও উদ্ভিদের কতকগুলি থেকে বর্ত্তমান পৃথিবীর নানা জাতীয় জীব ও উদ্ভিদের

জন্ম হয়েছে, এবং মানুষের জন্মেরও এই ইতিহাস। খৃষ্টান ধর্ম্মের আচার্য্যেরা বললেন এ মতবাদ ধর্ম্মের পরিপন্থী, কারণ বাইবেলের লিখিত সৃষ্টিতত্ত্বের সম্পূর্ণ বিপরীত। মানুষ ঈশ্বরের সন্তান নয় বানরের সকুল্য এ কথা যে প্রচার করে সে পাষণ্ড, যে বিশ্বাস করে সে মহাপাপী। আমেরিকার যুক্তরাজ্যের কয়েকটি ধর্ম্মপ্রাণ রাজ্য এই মত-প্রচারের বিরুদ্ধে সম্প্রতি আইন করেছে, এবং সে আইন-ভঙ্গের জন্ম লোকের শাস্তিও হ'য়েছে। বিংশ শতাব্দীর উদারপ্রাণ বৈজ্ঞানিকেরা যে ধর্ম্মের খাতিরে সৌরজগতের কেন্দ্রস্থলে সূর্য্যের অনধিকারপ্রবেশ রদ ক'রে সে স্থান পৃথিবীকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন, এবং বাইবেলের সৃষ্টিতত্ত্বই তত্ত্বকথা ব'লে মেনে নিচ্ছেন সে খবর এখনও পাওয়া যায় নি।

(২)

দিলীপকুমার বলবেন এ দু' জায়গায় সম্পূর্ণ পরের জিনিষকে ধর্ম্ম নিজের ব'লে আঁকড়ে রাখতে চেয়েছিল, সুতরাং তারা ছুটে গেছে। কথা ঠিক। কিন্তু তা থেকে কি এই প্রমাণ হয় না যে ধর্ম্মের রাজ্য জবরদখল করা দূরে থাক, ধর্ম্মের কবল থেকে নিজের রাজ্য উদ্ধার করতে করতেই বিজ্ঞানকে চলতে হ'য়েছে ? আর জ্ঞানের কোনও ক্ষেত্রে একবার কাজ আরম্ভ ক'রে পরস্বাপহরণের ভয়ে বিজ্ঞান সে ক্ষেত্র ছেড়ে গেছে এরও কোনও দৃষ্টান্ত নেই। বিংশ শতাব্দীর ধর্ম্মভীরু বিজ্ঞানেও নেই। মোট কথা বিজ্ঞানের জবরদখল ও দখলত্যাগ এ দুই-ই অমূলক। দিলীপকুমার বিলাতী পণ্ডিতদের পুঁথি থেকে যার বিরুদ্ধে চোখা চোখা 'কোটেশন'-বাণ নিক্ষেপ করেছেন তা বিজ্ঞান নয়, এক শ্রেণীর দর্শন। দর্শনের কাজ প্রধানতঃ দুইটি। 'জ্ঞান' ব্যাপারটিকে পরীক্ষা ক'রে তার স্বরূপ নির্ণয় করা, এবং জ্ঞান ও অনুভূতির যত কিছু বিষয় এক অখণ্ড দৃষ্টিতে দেখে তাদের চরম তত্ত্ব নির্দ্ধারণের চেষ্টা। আমাদের

দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনে এ দু'কাজের এক কাজও আমরা করি নে। এবং সুধু না ক'রেই কাজ চলে নয়, করি নে ব'লেই কাজ চলে। আমাদের জীবনধারণ ও সামাজিক জীবনের জন্য আমাদের নিজের শরীর, মন ও চার পাশের পৃথিবীকে জানতে হয়। এ জানা কি ক'রে সম্ভব, এবং সে জানার স্বরূপই বা কি, আমাদের ব্যবহারিক মন সে প্রশ্ন কখনও করে না। নিঃসন্দিগ্ধ বিশ্বাসে এই জানার উপর ভরসা ক'রে আমরা কাজ ক'রে যাই। যদি কখনও ঠেকি তবে নিজের বুদ্ধিচালনার দোষে বা অসাবধানতায় জানাটা ভুল বা অসম্পূর্ণ হ'য়েছিল ধ'রে নিই; এমন সন্দেহ কখনও করি নে যে বুদ্ধি পদার্থটিই এমন যে তা দিয়ে সব জিনিষের সব সত্য জানা যায় না, বা জিনিষটিই এমন যে সব সময় তাতে সত্য ব'লে কিছু থাকে না। দার্শনিকেরা বিচার ক'রে দেখান জ্ঞান জিনিষটি পরম রহস্যময়। বিচারে এও ধরা পড়ে—যে জ্ঞানের উপর ভরসা ক'রে আমরা সংসার করি তা লাভের যা-সব উপায় তাদের উপর বিন্দুমাত্র নির্ভর করা চলে না। আমরা দার্শনিকদের বিচার ও বিশ্লেষণশক্তির তারিফ ক'রে তাঁদের পরম রহস্যময় বস্তুটিকে নিতান্ত ঘরোয়া জিনিষের মত নিত্য ব্যবহার করি, এবং নির্ভরের একান্ত অযোগ্য জ্ঞানের উপায়-গুলির উপর পরম নির্ভরে ভর ক'রে জ্ঞের সংসারসমুদ্রে পাড়ি দিই। এই অসামঞ্জস্য যে আমাদের কিছুমাত্র কাবু করে না তার একটা কারণ ব্যবহারিক জীবনে দর্শনের দ্বিতীয় কাজটি করার আমরা চেষ্টা করি নে। আমাদের বিভিন্ন ক্ষেত্রের জ্ঞান ও বিভিন্ন ক্ষেত্রের অনুভূতিগুলিকে তাদের ভিন্ন ভিন্ন ক্ষেত্রে রেখেই আমরা স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করি। স্বতন্ত্রতার বেড়া ভেঙে তাদের সকলকে মিলিয়ে দেখতে গেলে ব্যাপারটা কি রকম দাঁড়ায় তা আমরা দেখতে চাই নে। এবং এ রকম মিলনের চেষ্টায় ভিন্ন ভিন্ন জ্ঞান ও অনুভূতির মধ্যে যেসব মারাত্মক গরমিল প্রকাশ পায়, এবং সে গরমিল মেটাতে গেলে এই সব জ্ঞান ও অনুভূতির রূপ ও

দামে যেসব অদলবদল ঘটে, স্বাতন্ত্র্যের ক্ষেত্রে যা প্রকাণ্ড ও প্রচণ্ড, সামঞ্জস্যের ক্ষেত্রে তা যে ক্ষুদ্র ও অকিঞ্চিৎকর হ'তে পারে সেসব সম্ভাবনাকে আমরা দূরে রেখে চলি। বিশুদ্ধ চিন্তার জগতে এই সামঞ্জস্যের চেষ্টা যারা করে তারা দার্শনিক। ঘরকন্নার জগতে এই সব গরমিলের কথা ভুলে যারা গোলমাল ঘটাতে চায় তারা 'ক্র্যাঙ্ক' বা উন্মাদ। আমাদের কাজে কর্ম্মে আমরা আমাদের বিভিন্ন রকমের অনুভূতিগুলিকে এক general electorate-এ আনার হাঙ্গামা পোহাতে চাই নে, তাদের প্রত্যেককে special electorate দিয়ে সহজে কাজ সারতে চাই।

আধুনিক বিজ্ঞান অধুনাতন লোকের চোখে যতই বিস্ময়কর হোক যে জ্ঞান এই বিজ্ঞানের লক্ষ্য তা আমাদের নিত্য-ঘরকন্নার জ্ঞানের সমশ্রেণীর জ্ঞান। এবং বৈজ্ঞানিক জ্ঞান-আহরণের করণ ও ধরণ ব্যবহারিক জীবনের জ্ঞান-প্রচেষ্টারই মাজা-ঘষা রাজসংস্করণ। কারণ, বিজ্ঞানের প্রস্থানভূমি ও সমাবর্ত্তনক্ষেত্র এ দুই-ই আমাদের ব্যবহারিক জীবনের অনুভূতি। আধুনিক বিজ্ঞানের অদ্ভুত সাফল্য, তার যন্ত্রপাতির জটিল কৌশল, তার সারথি গণিতের অব্যবসায়ীর অনধিগম্য রূপ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও ব্যবহারিক জ্ঞানের নিকট জ্ঞাতিত্ব অনেকটা ঢেকে রাখলেও, একটু মন দিয়ে দেখলেই এ দুয়ের শরীর ও মনে একবংশের ছাপ ধরা প'ড়ে যায়। ব্যবহারিক জ্ঞানের মত বৈজ্ঞানিক জ্ঞানও জ্ঞানের স্বরূপ ও সম্ভাবনার কোনও বিচার করে না। নিতান্ত নির্ভয়ে সে জ্ঞান-আহরণের কাজে লেগে যায়, জ্ঞানের চরম স্বরূপ কি এবং আছে কি না এ চিন্তা সে কখনও করে না। পরম নির্ভরের সঙ্গে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধি দিয়ে বিজ্ঞানজগৎকে জানতে চায়। পাছে এরা ভুল করে এজন্য বিজ্ঞানের সাবধানের অন্ত নেই। ইন্দ্রিয়ের ভুলের বিরুদ্ধে সে ইন্দ্রিয়কেই সব সময় সজাগ রেখেছে, তার ত্রুটি ঘুচাতে অদ্ভুত কৌশলী সব যন্ত্র আবিষ্কার ক'রে ইন্দ্রিয়ের শক্তি

সহস্র গুণে লক্ষ গুণে বাড়িয়ে চলেছে। বুদ্ধির ভুলের বিরুদ্ধে বুদ্ধিকে সে সর্ব্বদা সচেতন রেখেছে। কিন্তু এ প্রশ্ন বিজ্ঞানের কখনও মনে ওঠে না যে ইন্দ্রিয় ও বুদ্ধির মূল গড়নটা এমন কি না যে তা দিয়ে যথার্থই সত্য জানা যেতে পারে। এ সম্বন্ধে ব্যবহারিক জীবনের কাজকর্ম্মে আমরা যেমন নিঃসংশয়, বৈজ্ঞানিক জগতের কাজকর্ম্মে বৈজ্ঞানিকেরাও তেমনি নিঃসংশয়। এবং দুই সংশয়হীনতারই মূল এক—কোনও প্রশ্ন না তোলা।

(৩)

চার্ব্বাক প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছিলেন একমাত্র প্রত্যক্ষ ছাড়া জ্ঞানের আর কোনও উপায় নেই। অনুমান দিয়ে নিশ্চিত জ্ঞান হওয়া অসম্ভব, কারণ এক বিষয় থেকে বিষয়ান্তরের জ্ঞান হ'তে হ'লেই দুই বস্তুর নিত্যসম্বন্ধের জ্ঞান থাকা চাই। কিন্তু এই নিত্যতা-জ্ঞানের কোনও ভিত্তি নেই। আমাদের যা-কিছু অনুভূতি তা বিশিষ্ট দেশকালে বিশিষ্ট বিষয়ের অনুভূতি। এ থেকে কোনও নিত্যসম্বন্ধের নিশ্চিত জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়। সুতরাং ওরকম জ্ঞান অমূলক কল্পনা মাত্র। মাধবাচার্য্য তাঁর সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে চার্ব্বাকের এই যুক্তিকে বলেছেন 'দুশ্ছেদ্য'। কিন্তু কুসুমাঞ্জলি-প্রণেতা উদয়নাচার্য্য চার্ব্বাককে নিরুত্তর করার এক সোজা উপায় বের করেছেন। উদয়ন জিজ্ঞাসা করেছেন চার্ব্বাক যে তাঁর মত জনসমাজে প্রচার করেছেন সে কেন? নিশ্চয়ই লোকের সংশয় ঘোচাতে। কিন্তু লোকের মনে যে এ বিষয়ে কোনও সংশয় আছে তা চার্ব্বাক জানলেন কি ক'রে? পরের মন ত প্রত্যক্ষের বিষয় নয়। নিশ্চয়ই লোকের কথা, ব্যবহার, আকার, ইঙ্গিত থেকে তাদের মনের সংশয় অনুমান ক'রে চার্ব্বাক তাঁর মতপ্রচারে রত হয়েছেন। সুতরাং যে মত-প্রচারের মূলেই অনুমান, সে মতের পক্ষে অনুমানের প্রমাণত্বে

সন্দেহ নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। উদয়নাচার্য্যের এই তর্ক হ'চ্ছে দর্শনিক চার্ব্বাকের বিরুদ্ধে ব্যবহারিক চার্ব্বাকের সাক্ষী দাঁড় করান। * অষ্টাদশ শতাব্দীর ইউরোপে হিউম যে তর্ক তোলেন তা চার্ব্বাকের তর্কের অনুরূপ তর্ক। সে সম্বন্ধে দিলীপকুমার বারট্রাণ্ড রাসেলের বচন তুলেছেন—'The great scandals in the philosophy of science ever since the time of Hume have been causality and induction. We believe in both, but Hume made it appear that our belief is a blind faith for which no rational ground can be assigned'। দিলীপকুমার বলেছেন বিজ্ঞানের দুর্দ্দশায় এটা রাসেলের 'প্রকাশ্য অশ্রুপাত'। কিন্তু তাই কি? এ হ'চ্ছে হিউমের তর্কে রাসেলের ছদ্ম উদয়নী বিদ্রূপ। চার্ব্বাকের তর্কে কারও ব্যবহারিক জীবনের কোন পরিবর্ত্তন ঘটান প্রয়োজন হয় না, সুতরাং ও তর্ককে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা চলে। হিউমের তর্কেও কোন বৈজ্ঞানিক যুক্তির কোন পরিবর্ত্তন ঘটাতে হয় না সুতরাং সে তর্ককে পাশ কাটিয়ে গেলেই চলে। কারণ ব্যবহারিক জীবন ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞান সম্বন্ধে চার্ব্বাকের তর্ক ও হিউমের যুক্তি—

'বাক্যের ঝড় তর্কের ধূলি, অন্ধ বুদ্ধি ফিরিছে আকুলি,
প্রত্যয় আছে তারি মাঝখানে নাহি তার কোন ত্রাস।'

বিজ্ঞান যেমন ব্যবহারিক জীবনের মত জ্ঞানের সম্ভাবনা ও তার উপায়ের সামর্থ্যকে নির্ব্বিচারে মেনে নেয়, তেমনি নানা ক্ষেত্রের অনুভূতির স্বাতন্ত্র্যকেও স্বীকার ক'রে চলে। সমস্ত রকম অনুভূতির একটা সম্মিলিত রূপ আছে কি না বিজ্ঞান সে প্রশ্ন করে না। সুতরাং বিভিন্ন ক্ষেত্রের অনুভূতির যে সব জ্ঞানের সংহিতা সে রচনা ক'রে চলেছে তাদের সকল বচনের পরস্পরের সঙ্গে সামঞ্জস্য হয় কি না সে চিন্তা বিজ্ঞানের নেই। প্রতি ক্ষেত্রের সীমার মধ্যে অসামঞ্জস্য না থাকলেই

হ'ল। সমস্ত রকমের জ্ঞান ও অনুভূতিকে এক অখণ্ড ক'রে দেখা বিজ্ঞানের দেখা নয়, যেমন তা ব্যবহারিক জীবনের দেখা নয়। যে জানা 'একং বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি'—তা যেমন ব্যবহারিক জীবনের জানা নয়, তেমনি বিজ্ঞানেরও জানা নয়।

(৪)

দিলীপকুমার যে সব বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতদের ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের অবিরোধ-বাণীর মালা গেঁথেছেন তাঁরা বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের ও নিত্য ব্যবহারিক জ্ঞানের ভ্রাতৃত্ব জিনিষটি হয় ভাল ক'রে ভেবে দেখেন নি, নয় মন খুলে প্রকাশ ক'রে বলেন নি। তাঁরা ধরে নিয়েছেন যে আধুনিক বিজ্ঞান মানুষের অভিজ্ঞতায় এমন জিনিষ এনেছে যার ফলে তার ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতার জগতে নূতন সমস্যা উঠ্‌বেই উঠ্‌বে। তবে তাঁরা আশ্বাস দিয়েছেন যে এ সমস্যার সমাধান ক'রে ধর্ম্মকে বাঁচিয়ে রাখা যায়, এমন কি বিজ্ঞানের নিত্য উপচীয়মান বলে ধর্ম্মকেও বলীয়ান ক'রে তোলা যায়। হোয়াইট্‌হেডের যে Science and the Modern World গ্রন্থের বাণী দিলীপকুমার তাঁর চিঠির 'শ্রীদুর্গাশরণং' করেছেন সেই গ্রন্থে হোয়াইট্‌হেড লিখ্‌ছেন, "The progress of science must result in the unceasing codification of religious thought, to the great advantage of religion."—অর্থাৎ বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির ফলে ধর্ম্মজগতের চিন্তাবলী ক্রমাগত বিশদ ও সংহত হ'তে থাকবে, এবং সেটা ধর্ম্মের পক্ষে মহালাভ। কারণ, "In so far as any religion has any contact with physical facts, it is to be expected that the point of view of those facts must be continually modified as Scientific Knowledge advances. In this way, the exact relevance of these facts for religious

thought will grow more and more clear."—"ধর্মের সঙ্গে প্রাকৃতিক ঘটনার যখন যোগাযোগে রয়েছে তখন এটা স্বাভাবিক যে বিজ্ঞান যেমন অগ্রসর হ'তে থাকবে, এসব প্রাকৃতিক ঘটনার ধারণাও ক্রমাগত বদ্‌লাতে থাক্‌বে। এবং তার ফলে ধর্ম্মবিশ্বাসের সঙ্গে এ সব ঘটনার ঠিক সম্পর্কটি ক্রমশঃ পরিষ্কার হ'য়ে আস্‌বে।" এই জন্য পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের 'অসম্পূর্ণ বিজ্ঞানের' বন্ধন থেকে, ধর্ম্মের মুক্তিতে হোয়াইট্‌হেড খুসি আছেন। কারণ হোয়াইট্‌হেডের মতে প্রাচীন সব যুগের কাল্পনিক জগৎচিত্রের সাহায্যে নিজের বাণীকে প্রকাশ করতে গিয়ে ধর্ম্মের মধ্যে যে সব অবান্তর বিশ্বাস ও ধারণা প্রবেশ করেছে, ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ হ'চ্ছে প্রধানতঃ সেইসব ধারণা থেকে ধর্ম্মের স্বকীয় ভাব ও ধারণাকে বিযুক্ত করা। "This evolution of religion is in the main a disengagement of its own proper ideas from the adventitious notions which have crept into it by reason of the expression of its own ideas in terms of the imaginative picture of the world entertained in previous ages. Such a release of religion from the bonds of imperfect science is all to the good." হোয়াইট্‌হেড বেশ ভাল ক'রেই জানেন পূর্ব্ব পূর্ব্ব যুগের science যেমন imperfect ছিল এ যুগের science ও তেমনি imperfect এবং চিরযুগই science imperfect থাক্‌বে। সেটা বিজ্ঞানের পক্ষে কিছুমাত্র নিন্দার কথা নয়। কারণ হোয়াইট্‌হেড যাকে বলেছেন "stubborn facts" তাদের নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানকে তার 'imaginative picture of the world' ক্রমাগত বদ্‌লাতে হবে। সুতরাং পূর্ব্ব যুগের imperfect science-এর বন্ধন থেকে ধর্ম্মের মুক্তি যদি কাম্য হয় তবে বর্ত্তমান ও ভাবী যুগের imperfect science থেকে ধর্ম্মের মুক্তিও সমান কাম্য হওয়া উচিত। কিন্তু তা

হ'লে বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতিতে ধর্ম্মের মহালাভের হিসাবটা অনেক balance sheetএর মতই একেবারে অবোধ্য হয়ে ওঠে। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে ধর্ম্মের পা ফেলে চলার অর্থ এক 'imaginative picture of the world' ছেড়ে অন্য 'imaginative picture of the world' নিয়ে কারবার আরম্ভ করা, যতক্ষণ না নূতন আর একটা 'imaginative picture of the world' উপস্থিত হয়। এবং ধর্ম্মের কাজই দাঁড়ায় বৈজ্ঞানিক ধারণার বন্ধনে নিজেকে বদ্ধ করা আর মুক্ত করা, যেমন হোয়াইট্‌হেড কল্পনা করেছেন। আপনার মুখেই শুনেছি কে একজন আমেরিকান লেখক লিখেছেন যে হোয়াইট্‌হেড ধর্ম্মের যে স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করেছেন, সে হ'চ্ছে ভারতবর্ষের Native Princeদের স্বাধীনতা; Science-এর political agent সঙ্গে লেগেই আছে। হোয়াইট্‌হেড যে ধর্ম্মের সঙ্গে বিজ্ঞানের সম্বন্ধ বিচার করেছেন সে ধর্ম্ম ইউরোপের গির্জ্জার উপদিষ্ট খৃষ্টান ধর্ম্ম হ'তে পারে। দিলীপকুমার যাকে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা ব'লে জানেন তার সঙ্গে ও বিচারের সম্বন্ধ খুব কম।

যেমন বৈজ্ঞানিক জ্ঞান আমাদের নিত্যব্যবহারিক জ্ঞানের সঙ্গে মূলতঃ এক শ্রেণীর, তেমনি বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের বিরোধ-অবিরোধের রহস্য আমাদের ব্যবহারিক জীবনের সঙ্গে ধর্ম্মের বিরোধ-অবিরোধ-রহস্যের সঙ্গে অভিন্ন, এবং এ রহস্যের মীমাংসাও এক। আধুনিক বিজ্ঞান এ রহস্যের মধ্যে নূতন কোনও মৌলিক সমস্যা আনে নি, এবং এ রহস্যের সমাধানে নূতন কোনও আলোও ফেলে নি। আমাদের দেশের প্রাচীন লোকায়তেরা, এবং প্রাচীন গ্রীসের 'স্কেপটিকেরা' যে সব তর্কের অস্ত্রে মানুষের ধর্ম্ম-বিশ্বাস ও আধ্যাত্মিকতাকে আক্রমণ করেছিলেন, আধুনিক scientific materialismএর হাতেও ঠিক সেই সব অস্ত্রই রয়েছে। আদিম তীরধনুক এ ক্ষেত্রে 'মেশিন গান্' হ'য়ে ওঠে নি। তবে যদি

বিজ্ঞানের নামে সেই সব প্রাচীন তর্কের মর্য্যাদাই আধুনিক কালে বেড়ে গিয়ে থাকে, তার কারণ আমাদের বর্ত্তমান জীবনযাত্রায় আধুনিক বিজ্ঞানের প্রভাব অপরিসীম। আমাদের খাওয়া পরা বাঁচা মরা সবই এই বিজ্ঞানের হাতে। সুতরাং জীবনযাত্রার ক্ষেত্রে, অর্থাৎ সব মানুষের জীবনের যা প্রধান ক্ষেত্র, এবং অনেক মানুষের জীবনের যা একমাত্র ক্ষেত্র—সেখানে বিজ্ঞানের 'প্রেষ্টিজের' অন্ত নেই। এবং এই 'প্রেষ্টিজ' যে ক্ষেত্রে তার প্রাধান্য তা ছাড়া সম্পূর্ণ বিভিন্ন ক্ষেত্রেও আমরা বিজ্ঞানের প্রাপ্য ব'লে মেনে নিচ্ছি। এটা স্বাভাবিক। ওকালতি বা ভূষিমালের ব্যবসায় যে বড় হ'য়েছে সাহিত্য-সভায় তাকে আমরা নিত্য মোড়লি করতে দিচ্ছি।

(৫)

প্রকৃত কথা এই যে আধুনিক বিজ্ঞান বর্ত্তমান জগতের জ্ঞান ও কর্ম্মের ক্ষেত্রে প্রধান ও প্রকাণ্ড হ'য়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে তাকে অবলম্বন ক'রে একটা দর্শন-শাস্ত্র গ'ড়ে উঠেছিল। ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার বিরোধ বিজ্ঞানের সঙ্গে নয় বিজ্ঞানমুগ্ধ এই দর্শনের সঙ্গে। কারণ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্র এত বিভিন্ন যে তাদের পরস্পরের সংঘর্ষ সম্ভব নয়। কিন্তু scientific materialism বিজ্ঞান নয় দর্শন। অর্থাৎ কোনও বিশিষ্ট শ্রেণীর অনুভূতির বিশিষ্ট রকমের জ্ঞানলাভে সে খুসি নয়, সকল অনুভূতির চরম স্বরূপ কি সেইটি জানাই তার কাজ। এবং বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে যা কিছু আছে তার চরম স্বরূপ যে জানা গেছে এ বিষয়ে ঊনবিংশ শতাব্দীর এই দর্শন শাস্ত্রটির কোনও সন্দেহ ছিল না। সকল পদার্থের চরম রূপ অর্থাৎ স্বরূপ হ'চ্ছে অতি ক্ষুদ্র বস্তুকণা যারা নিউটনের আবিষ্কৃত নিয়মে পরস্পরের সম্পর্কে গতিশীল। অর্থাৎ নিউটন বস্তু ও তার গতির যে নিয়ম অবলম্বন ক'রে গ্রহ-উপগ্রহদের গতিবিধির ব্যাখ্যা করেছিলেন বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল পদার্থই সেই নিয়মের অধীন। প্রতি

পদার্থ, যার প্রকৃত সত্ত্বা আছে, এই গ্রহ-উপগ্রহদের আণবিক সংস্করণ বস্তুকণার সমষ্টি, এবং তারা ঐ একই নিয়মে স্থিতি ও গতিশীল। পদার্থের যা-কিছু গুণ ও ব্যাপার তা তার এই বাস্তবতা ও গতির ফল। সুতরাং কোনও পদার্থ বা ঘটনাকে এই, বস্তুকণা ও তাদের গতিতে বিশ্লেষণ ক'রে দেখ্‌তে পারলেই তাদের সম্বন্ধে চরম সত্য জানা গেল। কারণ যা-কিছু আছে বা ঘটে তাদের স্বরূপ হ'চ্ছে গতিশীল বস্তুকণা। সকলেই জানে জ্যোতিষ ও পদার্থ-বিজ্ঞানে নিউটন প্রবর্ত্তিত ব্যাখ্যার আশ্চর্য্য সাফল্যে ঐ ব্যাখ্যা সকল বৈজ্ঞানিক-ব্যাখ্যার আদর্শ ব'লে গণ্য হ'য়েছিল। অন্ত সব বিজ্ঞান যে তাদের বিষয়বস্তুতে নিউটনের গতিবিদ্যার সূত্রগুলি প্রয়োগ করতে পেরেছিল তা নয়, কিন্তু কি রাসায়নিক কি প্রাণতত্ত্ববিদ্ সকলেই ধ'রে নিয়েছিল যে তাদের বিজ্ঞান যখন চরম জ্ঞানে পৌছবে তখন দেখা যাবে যে সেগুলি নিউটনীয় পদার্থবিজ্ঞানের বিশেষ বিশেষ দৃষ্টান্ত মাত্র। এখন যে সেরকম দেখান যাচ্ছে না তার একমাত্র কারণ এই সব বিজ্ঞান এখনও পূর্ণতা লাভ করেনি; আদর্শ থেকে অনেক পিছিয়ে আছে। অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের এই কল্পিত আদর্শকেই scientific materialism তত্ত্ববিদ্যা-বোধে গ্রহণ করেছিল।

বলা বাহুল্য এ তত্ত্ববিদ্যা ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার সম্পূর্ণ পরিপন্থী। মানুষের সমস্ত অনুভূতি, তার মন, তার বুদ্ধি, তার হৃদয়বৃত্তি যদি কতকগুলি বস্তুকণা, যাদের বাস্তবতা ছাড়া আর কোনও ধর্ম্ম নেই, তাদের গতিবৈচিত্র্যের ফলমাত্র হয়, তবে মানুষের জীবনে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার কোনও স্থান থাকে না। বিশেষ রকমের ধর্ম্ম-বিশ্বাস সামাজিক শান্তি ও সমাজবন্ধন-পরিপুষ্টির সহায় হ'তে পারে, শ্রেণী বিশেষের আধ্যাত্মিকতা মানুষের শোকে দুঃখে সান্ত্বনা দিতে পারে, কিন্তু এ সব অজ্ঞানীর জন্য। কারণ এদের ভিত্তি অসত্যে প্রতিষ্ঠিত। যে জ্ঞানী সে জানে চঞ্চল বস্তুকণার বাইরে আর কিছুই নেই।

(৬)

বিংশ শতাব্দীর পদার্থ-বিজ্ঞান এই বস্তুকণা ও তাদের গতি-নিয়মের পরিকল্পনাকে বৈজ্ঞানিক মূলতত্ত্ব ব'লে মান্‌তে পারছে না। পরীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যাকে বস্তুকণা মনে করা হ'য়েছিল তা কতকগুলি বিদ্যুৎকণার সমষ্টি, যাদের গতিবিধি নিউটনের গতিবিজ্ঞানের সূত্র মেনে ত চলেই না, এমন কি কোনও নিয়মকানুন মেনে চলে কি না সন্দেহের কথা। কারণ, বৈজ্ঞানিকেরা এ পর্য্যন্ত যতদূর দেখেছেন তাতে এই বিদ্যুৎকণাগুলির দলের আচরণ সম্বন্ধে গড়পড়তা হিসাবে যদিও কতকটা হদিস পাওয়া যায়, প্রতি বিদ্যুৎকণার গতিবিধি কখন যে কি রকম হবে তার কোনও নিয়ম নেই বলেই বোধ হয়। যেমন এ বছর বাঙলাদেশে কলেরায় কত লোক মারা যাবে তার একটা মোটামুটি হিসাব অনুমান করা যায়, কিন্তু কোনও বিশেষ লোক কলেরায় মরবে কি না তা অনুমান করা অসম্ভব। এ থেকে এমন কথাও উঠেছে যে বিজ্ঞান যেসব প্রাকৃতিক নিয়ম আবিষ্কার করে সেগুলি এই রকম 'ষ্ট্যাটিস্‌টিকাল' খবর ছাড়া আর কিছু নয়। তার পর যে অনন্ত ও অনপেক্ষ দেশ ও কালের ধারণার উপর নিউটনের গতি-বিজ্ঞানের ভিত্তি তা অস্থির হ'য়ে উঠেছে। এমন সব ব্যাপার জানা গেছে যার ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বৈজ্ঞানিকদের ও-ধারণা ত্যাগ করতে হ'য়েছে। তাঁরা বলছেন অনপেক্ষ দেশ ও অনপেক্ষ কাল এ দুই-ই কল্পনামাত্র, ওদের কোনও অস্তিত্ব নেই। যা আছে সে হ'চ্ছে দেশখণ্ড ও কালমুহূর্ত্তে মেশান অর্দ্ধ-নারীশ্বর গোছের একটা কিছু যার সম্বন্ধে আঁক কষা যায়, কিন্তু যাকে ধারণা করা যায় না। সুতরাং 'গতি' ব্যাপারটি, যার সরল ধারণা ছিল পরিমিত কালে বস্তুর দেশ থেকে দেশান্তরে গমন, তার অবস্থা কি দাঁড়াচ্ছে কল্পনা করা সহজ নয়। অর্থাৎ যে নিউটনীয় বস্তু ও গতিকে scientific materialism অস্তিত্বের মূলতত্ত্ব মনে করেছিল আজকের scienceএ সে বস্তুও নেই, সে গতিও নেই।

(৭)

একদল উৎসাহী লোক, যাঁদের কেউ বৈজ্ঞানিক কেউ দার্শনিক, অথবা space-timeএর মত তাঁদের সবাই বৈজ্ঞানিক—দার্শনিক, এ থেকে প্রচার করছেন যে ধর্ম্মের পথ এবার মুক্ত। ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার একান্ত বাধা ছিল আধুনিক বিজ্ঞানের সব মূলতত্ত্ব। অত্যাধুনিক বিজ্ঞান তাদের দূর ক'রে দিয়ে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার পথ বাধামুক্ত করেছে। এখন বিজ্ঞান ধর্ম্মের শুধু অপরিপন্থী নয়, সহায় বল্‌লেই চলে। উৎসাহ যাদের ক্ষীণ এসব কথায় তাদের কিছু খটকা লাগে। আধুনিক বিজ্ঞান কতকগুলি মূলতত্ত্ব স্বীকার ক'রে অনেক জাগতিক ব্যাপারের একটা বিশেষ রকমের ব্যাখ্যা দিতে সমর্থ হ'য়েছিল। ঐ সব তত্ত্বের একমাত্র মূল্য ও প্রামাণ্য ছিল এই ব্যাখ্যার সামর্থ্য। আজ বৈজ্ঞানিকেরা এমন কতকগুলি ব্যাপার আবিষ্কার করেছেন ও-সব তত্ত্ব দিয়ে যাদের ও-রকমের ব্যাখ্যা দেওয়া চলে না। সুতরাং অত্যাধুনিক বিজ্ঞান পুরাতন বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের কতক রদ-বদল ক'রে, কতক নূতন পরিকল্পনা ক'রে এমন কতকগুলি মূলতত্ত্ব স্বীকার করছে যা দিয়ে পূর্ব্বের জানা ও নবীন-আবিষ্কৃত সকল ব্যাপারের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়। এ সব নবীন তত্ত্বেরও পরমায়ু ততদিন যতদিন জাগতিক ব্যাপারের এই ব্যাখ্যার কাজে এরা লাগসই থাকবে। যেদিন এমন ব্যাপার জানা যাবে যার ব্যাখ্যা এ-সব তত্ত্ব দিয়ে হয় না, সেদিন আধুনিক বিজ্ঞানের মূলতত্ত্ব যে পথে গিয়েছে অত্যাধুনিক বিজ্ঞানের মূলতত্ত্বও সেই পথেই যাবে। এই অচিরশীল মূলতত্ত্বের ঊনবিংশ শতাব্দী পর্য্যন্তের তত্ত্বগুলি ছিল ধর্ম্মের শত্রু, আর বিংশ শতাব্দীর তত্ত্বগুলি হ'য়েছে ধর্ম্মের সুহৃদ এ মনে করার কোনও সঙ্গত কারণ পাওয়া যায় না। 'এটম্' ছিল ধর্ম্মের পথ বন্ধ ক'রে আর 'ইলেকট্রনে' গুঁড়ো হ'য়েই তারা হ'ল তার পথের সঙ্গী, এক 'Will to believe' ছাড়া এ বিশ্বাসের আর কোনও হেতু নেই। দেশ ও কালের দ্বন্দ্বসমাস যে আধ্যা-

ত্মিকতার পরিপন্থী, আর দেশকালের বহুব্রীহি যে তার সহায় এ তত্ত্ব প্রমাণ করা পাণিনিরও অসাধ্য। আর যদি ধ'রেই নেওয়া যায় যে Quantum theory, প্রোটন ও ইলেক্‌ট্রন, general theory of Relativity এরা ধর্ম্মপথের বিঘ্ন দূর ক'রে আধ্যাত্মিকতার সহায় হ'য়েছে তবেই বা ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের এ মিতালি টিঁকবে কতদিন? বিংশ শতাব্দীর এই বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলি যে নিউটনীয় পদার্থ-বিজ্ঞানের সমকালও বেঁচে থাকবে এ কথা কোনও বৈজ্ঞানিক জোর ক'রে বল্‌তে পারেন না। এবং আগামী কালে যেসব নূতনতর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের প্রতিষ্ঠা হবে তাঁর সঙ্গে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সম্বন্ধ কি রকম দাঁড়াবে তা কে জানে? কারণ সে সব তত্ত্বের পরিকল্পনা হবে নিশ্চয়ই ধর্ম্ম-বিশ্বাসের মুখ চেয়ে নয়, নূতন আবিষ্কৃত জাগতিক ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যার গরজে। আজকের বিজ্ঞান যদি আধ্যাত্মিকতার হাতে চাঁদ তুলে দিয়ে থাকে, তবে কালকের বিজ্ঞানের সে হাতে দড়ি পরাতে কতক্ষণ?

এ সব আশা ও আশঙ্কার গোড়ায় গলদ হ'চ্ছে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের লক্ষ্য যে মানুষের সমস্ত অনুভূতির সম্যক জ্ঞান নয় আংশিক অনুভূতির ঐকদেশিক জ্ঞান, সে কথা ভুলে থাকা। অথচ বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানের সামনে দাঁড়িয়ে এ ভুল হওয়া বড়ই আশ্চর্য্য। বিংশ শতাব্দীর এই নব-বিজ্ঞান গ'ড়ে উঠ্‌ছে খুব উঁচু গণিতের সুবহুল প্রয়োগে। এ বিজ্ঞানে পরীক্ষালব্ধ জ্ঞানের দশগুণ হ'চ্ছে তার গণিতিক ব্যাখ্যা ও অনুমান। এডিংটন রহস্য ক'রে বলেছেন পূর্ব্বে স্রষ্টিকর্ত্তা ছিলেন ইন্‌জিনিয়ার এখন তিনি হ'য়েছেন গণিতবিদ্‌। এই গণিতশাস্ত্র মানুষের হাতে এক অদ্ভুত-কৌশলী অমিতবলশালী যন্ত্র। কিন্তু আর সব যন্ত্রের মতই যে বিষয়বস্তুতে প্রয়োগের জন্য তার উদ্ভাবনা তার বাইরে তাকে প্রয়োগ করা চলে না। বস্তু বা অনুভূতির যে অংশ গণিতের বিষয় সেটা তার সমগ্রতার একটা দিক মাত্র। সুতরাং সুধু গণিত দিয়ে কোনও বস্তু বা অনুভূতিকে

সম্পূর্ণ ক'রে জানা অসম্ভব। এবং যে বিজ্ঞানের প্রধান সহায় গণিত তার পক্ষেও অসম্ভব। জেলের জাল তৈরী হ'য়েছে মাছ ধরার কাজে, তা দিয়ে জল ধরা যায় না। তা থেকে কোনও জেলে এ কথা ভাবে না যে পৃথিবীতে সুধু মাছই আছে জল নেই। কিন্তু অনেক পণ্ডিত লোকের বিশ্বাস যে গণিত-সহায় বিজ্ঞান সৃষ্টির যে জ্ঞান দেয় তার বাইরে আর কিছুই নেই।

Scientific materialism এর গোড়া কাটা যায় বৈজ্ঞানিক জ্ঞানমাত্রের এই স্বরূপ-বিশ্লেষণে। নইলে নিউটনীয় ফিজিক্স বরখাস্ত হ'য়েছে ব'লেই সে কিছু বিদায় হবে না, আইন্‌ষ্টিনীয় ফিজিক্সকে মুরুব্বী ধ'রে স্বচ্ছন্দে টি'কে থাকবে। পরমাণুর law and order-মাফিক চলাফেরার জায়গায় ইলেকট্রনের civil disobedience মুখ-বদলান হিসাবে কিছু মন্দ নয়। আলোর রেখা সূর্য্যের কাছ-বরাবর এক ইঞ্চির কম না বেঁকে পৌনে দুই ইঞ্চি বেঁকুছে দেখেই ধর্ম্মরাজ্যপ্রতিষ্ঠার ভয়ে পালিয়ে বাঁচবে scientific materialism এত বড় নির্ব্বোধ নয়।

(৮)

ব্যবহারিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের এই সমালোচনা সুধু এই প্রমাণ করে যে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার দাবী অমূলক নাও হ'তে পারে; সে দাবী যে সত্য এ কথা প্রমাণ করে না। শঙ্করের ভাষায় এ সমালোচনা মিথ্যাজ্ঞান নাশ করে, কিন্তু তত্ত্বজ্ঞানের প্রতিষ্ঠা করে না। যদি কেউ তর্ক করে যে আধুনিক বিজ্ঞান বিশ্বজগতের এমন নিরেট চেহারা আবিষ্কার করেছে, যে তা দিয়ে ধর্ম্মের জল এক বিন্দুও গ'লতে পারে না, তবে সেই তার্কিককে এই সমালোচনার মাইক্রস্কোপ দিয়ে দেখান যায় যে তাঁর নিরেট বস্তুটি ফুটোয়-ভরা ঝাঝরি বিশেষ। কিন্তু তা দিয়ে গ'লে যাবার

জল আছে কি না সে খবর এ মাইক্রসকোপ দেয় না। জলের জ্ঞান হয় জল দেখে, ফুটো দেখে নয়।

ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার ব্যাপারে যাঁরা expert, অর্থাৎ ও বস্তুর কথা যারা দেখে জেনেছেন শুনে শেখেন নি, তাঁরা সবাই একবাক্যে বলেছেন, 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ'। যে লৌকিক যুক্তি-তর্ক ব্যবহারিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বাহন তাতে চ'ড়ে এ রাজ্যে পৌছান যায় না। বিজ্ঞান দিয়ে যারা আধ্যাত্মিকতা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তারা তাদেরি জ্ঞাতি-ভাই বিজ্ঞান দিয়ে যারা আধ্যাত্মিকতাকে উড়িয়ে দিতে চায়। বিজ্ঞানের এই মারণবলের উপর বিশ্বাস আর সৃষ্টিশক্তির উপর ভরসা এক মনোভাবের এপিঠ ওপিঠ। মানুষের অনুভূতির এক শ্রেণীর 'stubborn facts' এর উপর তার বিজ্ঞানের ভিত্তি, আধ্যাত্মিকতার প্রতিষ্ঠাও তার অনুভূতির 'stubborn facts' এর উপর। কিন্তু এ অনুভূতি তার লৌকিক অনুভূতিগুলির এক পর্য্যায়ে নয়। আমাদের ব্যবহারিক জীবনযাত্রার এ stubborn fact কখনও মাথা তোলে না, সুতরাং তাকে অস্বীকার করলেও কোথাও ঠেকতে হয় না।

গোল এইখানেই। এ stubborn fact যার মন অনুভব করেছে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা তার কাছে প্রমাণের বিষয় নয়; তার "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্ব সংশয়াঃ"; ও বস্তু তার কাছে স্বপ্রকাশ। আর যার মনে সে অনুভূতি কখনও আসে নি তার কাছে ওকে প্রমাণ করা যাবে না। কারণ, লৌকিক অনুভূতি থেকে এ অনুভূতিতে পৌছবার কোনও সেতু নেই। শ্রীরাধা যেমন ক'রে বাঁশের ঝাড় ডালেমূলে উপড়াতে চেয়েছিলেন, scientific materialismকে তেমনি আমূল উপড়িয়ে ফেললেও সংশয়ের বাঁশী তার কানে বাজতেই থাক্‌বে।

আধ্যাত্মিকতার বাধা আধুনিক বিজ্ঞান নয়, সে বাধা হ'চ্ছে মানুষের চিরন্তন লৌকিক জীবন। এ জীবনের বজ্রকুম ভেদ ক'রে যার প্রাণে

আধ্যাত্মিকতার স্পর্শ পৌঁছে নি তাকে দোষ দেওয়া বৃথা, তার সংশয়কে উপহাস করা মূর্খতা। হয় ত কোনও শুভ সুযোগে অলোক-লোকের একটিমাত্র রশ্মিপাতে তার সমস্ত মন আলোয় ভ'রে উঠবে, যদি সে মন গতানুগতিক ধর্ম্মের অস্বচ্ছতা ও সেণ্টিমেণ্টাল আধ্যাত্মিকতার কুয়াশামুক্ত হয়।

(৯)

চিঠিটা গভীর না হোক গম্ভীর হ'য়ে উঠেছে, অতএব এইখানেই ইতি দেওয়া যাক। লক্ষ্য করেছেন বোধ হয় 'ধর্ম্ম' ও 'আধ্যাত্মিকতা' এ দুটি কথা বার বার বলেছি-কিন্তু ও-বস্তু যে কি তা বলার ধার দিয়েও যাই নি। কারণ আমি জানিনে, এবং অনুমান করি আপনিও জানেন না। সুতরাং ধ'রে নিয়েছি আর সবাই জানে।

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

বিজ্ঞানের সুমতি।*

"What is the most fundamental need of man ?......I hazard the belief that the majority, if the suggestion were put before them, would agree that his deepest need was to discover something, some being a power, some force or tendency, which was moulding the destinies of the world—something not himself, greater than himself, with which he yet felt that he could harmonize his nature, in which he could repose his doubts, through faith in which he could achieve confidence and hope......"

Essays of a Biologist by Julian Huxley.

শ্রীদিলীপ কুমার রায়

(খোলা চিঠি)

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত করকমলেষু—

জ্যৈষ্ঠের 'বিচিত্রা'য় আপনার "ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান" খুব ভাল লাগ্‌ল। মাসিক সাহিত্যের পৃষ্ঠায় এ-রকম চিন্তোদ্দীপক প্রবন্ধের দেখা কমই মেলে। কেবল আপনার কথা প'ড়ে আমারও ফের দুএকটা কথা মনে হ'য়েছে। সে কথা কটি লেখ্‌বার জন্যেই ফের এ কলম-ধরা।

প্রথমেই ব'লে রাখি যে আপনার বিজ্ঞানের সম্বন্ধে নানা মতামত পড়তে পড়তে খুসি হওয়া গেল, দেখে যে, আমার "বিজ্ঞানের ট্রাজিডি"-র

---

* ভারতবর্ষ, অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭।

মূল প্রতিপাদ্য বিষয়টির সঙ্গে আপনার মতদ্বৈধ নেই। আপনি অকুণ্ঠেই মেনে নিয়েছেন যে "বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্র এত বিভিন্ন যে তাদের পরস্পরের সংঘর্ষ সম্ভব নয়।" আমার যে-দুএকটি উক্তির বিরুদ্ধে আপনি মত প্রকাশ ক'রেছেন, সে-উক্তিগুলি ভুলই হোক্ বা ঠিকই হোক্—মুখ্য নয়, গৌণ। তবু, এ সম্বন্ধেও কিছু বলতে যাওয়া আশা করি ধৃষ্টতা ব'লে গণ্য করবেন না। কিন্তু তার আগে আপনার প্রবন্ধটির সম্বন্ধে আমার একটি আপত্তি আছে।

সে আপত্তিটি হচ্ছে এই যে, আপনার নানা মন্তব্যের মধ্যকার নানা কটাক্ষ-তীরন্দাজি ঠিক্ আমার যুক্তির বিরুদ্ধে নিক্ষিপ্ত না হ'লেও আপনার লেখার ছাঁদটি একটু দ্ব্যর্থক হ'য়েছে। অন্ততঃ লোকের মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয় যে, আপনি আমার উক্তির কতকগুলি ইম্‌প্লিকেশনকে লক্ষ্য ক'রেই লক্ষ্যবেধ করবার চেষ্টা পেয়েছেন। সেইজন্যে গোড়ায়ই ব'লে রাখতে চাই যে "বিজ্ঞানের ট্রাজেডি"-তে আমি এমন কোনো কথাই বলি নি যাতে ক'রে লোকের মনে হ'তে পারে যে তার কীর্ত্তির মহিমা অস্বীকার করবার কোন দুষ্ট দুরভিসন্ধি আমার ছিল। এমন ইঙ্গিতও তো কোথাও প্রকাশ করি নি যা থেকে সিদ্ধান্ত করা চলে যে আধ্যাত্মিকতার সত্যাসত্য বিজ্ঞানের ব্যবচ্ছেদ-মন্দিরের বিশ্লেষণের অপেক্ষা রাখ্‌তে বাধ্য। ও প্রবন্ধটিতে আমি দুটি কথা স্পষ্ট হরফে লিখেছি: (১) "ধর্ম্মের যুগকে গত মনে করার কোনো সঙ্গত কারণই নেই"; এবং (২) "হৃদয়-বৃত্তির দ্বারা যে-সব উপলব্ধি আমাদের লাভ হয়, সে-সবের সত্য, যুক্তি বা বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণও হ'তে পারে না, অপ্রমাণও হ'তে পারে না।" বলা বাহুল্য, এ দুটি ক্ষেত্রেই আপনি আমার সঙ্গে সায় দিয়েছেন। আপনি নিরাপত্তিতে মেনে নিয়েছেন: (১) "বিজ্ঞান নানাক্ষেত্রের অনুভূতির স্বাতন্ত্র্যকে স্বীকার ক'রে চলে"—কাজেই ধর্ম্মের অনুভূতির স্বাতন্ত্র্য বা যাথার্থ্য যে বিজ্ঞানের আলোয় মেকি ব'লে প্রমাণ

হ'য়ে গেছে তা নয়; এবং (২) "বিজ্ঞান দিয়ে যারা আধ্যাত্মিকতা প্রতিষ্ঠা করতে চায় তারা তাদেরই জ্ঞাতি-ভাই—বিজ্ঞান দিয়ে যারা আধ্যাত্মিকতাকে উড়িয়ে দিতে চায়।" এ কথা আজকালকার বিজ্ঞান-জগতের পুরোধাগণ ("high-priests of science") মেনে নিতে আগেকার মতন দ্বিধা করছেন না। জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিংটন প্রকাশ্যেই মেনে নিয়েছেন :—

"Natural law (অর্থাৎ বিজ্ঞানের আইনকানুন) is not applicable to the unseen world behind the symbols, because it is unadapted to anything except symbols...you cannot apply such a scheme to the parts of our personality which are not measurable by symbols any more than you can extract the square-root of a sonnet." *

সুতরাং বেশ দেখা যাচ্ছে যে আসল কথাটা বুঝতে বা মেনে নিতে আপনার একটুও বাধে নি। কেবল (পুনরুক্তি মার্জ্জনীয়) আপনি নানা স্থলে যে-ছাঁদে লিখেছেন—এবং বিশেষ ক'রে গোড়ায়ই যে সুরে সুরু ক'রেছেন তাতে আমার প্রথমটায় নিজেরই মনে হ'য়েছিল যে, বুঝি আমি লিখেছি যে বিজ্ঞানের সব কীর্ত্তিই ভুয়ো ব'লে নিঃসংশয়িত ভাবে প্রমাণ হ'য়ে গেছে। বলাই বেশি যে আপনার প্রবন্ধের এ অস্পষ্টতায় আপত্তি করার আমার অধিকার আছে। কারণ আমি কোথাও ইঙ্গিত করি নি যে "জ্ঞানের কোনো ক্ষেত্রে একবার কাজ আরম্ভ ক'রে পরস্বাপহরণের ভয়ে বিজ্ঞান সে-ক্ষেত্র ছেড়ে গেছে।" আমি শুধু ব'লেছি যে আধুনিক চিন্তাশীল মানুষ (ও বৈজ্ঞানিকও) আবিষ্কার ক'রেছেন যে বিজ্ঞান প্রথমটায় স্বাধিকার-প্রমত্ত হ'য়ে এমন সব বিষয়ে অম্লানবদনে রায় দিতে সুরু ক'রেছিল, যে-সব বিষয়ে রায় দেওয়ার অধিকারী সে নয়। আপনিও

* Science and Unseen World.

তো মৃদু-ব্যঙ্গে এ কথায় সায় দিয়ে ব'লেছেনঃ—"ওকালতি বা ভূষি-মালের ব্যবসায় যে বড় হ'য়েছে, সাহিত্য-সভায় তাকে আমরা নিত্য মোড়লি করতে দিচ্ছি।" বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টিণ্ডাল তাঁর জগৎ-প্রসিদ্ধ "বেল্‌ফাষ্ট অ্যাড্রেস"-এ এ-রকমটা ঘটার কারণ-নির্দ্দেশ ক'রেছেন এই ব'লে যে "When the human mind has achieved greatness and given evidence of extraordinary power in one domain", তখন অ-ভূয়োদর্শী মানুষের মনের মধ্যে প্রায়ই জন্মায় দেখা যায় "a tendency to credit it with similar power in all domains." এর দৃষ্টান্তের অভাব নেই। তাই মানব-মনের এ ব্যাপক দুর্ব্বলতার স্বপক্ষে ওকালতি করবার সূত্রে আপনি সলজ্জে ব'লেছেন "এটা স্বাভাবিক।" মানি—কেবল সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও আপনাকে মান্‌তে হবে যে, যা কিছু স্বাভাবিক তার অসারতার দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করার এক্তিয়ার মানুষের চিরন্তন। আর "বিজ্ঞানের ট্র্যাজিডি"-তে আমি এ-ছাড়া কীই বা ক'রেছি বলুন?

আপনার আর একটা যুক্তির সারবত্তা বা 'পয়েণ্ট' আমি কিছুতেই ধরতে পারছি না। আপনি ব'লেছেন, স্বাধিকার-প্রমত্ত হ'য়ে পরের এলাকায় যে ট্রেসপাস ক'রেছে, সে বিজ্ঞান নয়—বিজ্ঞানমুগ্ধ দর্শন। আমার বক্তব্য—দায়িত্ব-নির্ণয়ের সময়ে এরূপ সূক্ষ্মবিচার একটু অবান্তর। এ-বিচার 'অ্যাকাডেমিক'। ফলে যদি পোকা ধরে তার জন্যে গাছকেও দায়ী করবে না মানুষ? যে-মনোভাব বিজ্ঞানের আমদানীর ফলেই জন্মেছে ও বিজ্ঞানের অনুমোদনের স্নেহেই লালিত হ'য়েছে, সে-মনোভাবের জন্যে বিজ্ঞানকে দায়ী করা অযৌক্তিক বলা চলে কি? ধরুন, দেশপ্রেমের মূল প্রেরণা বলে না, যে অপরের দেশকে অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা না করলে নিজের দেশকে ভালবাসা যায় না। যুক্তি অনবদ্য। কিন্তু মুস্কিল এই যে মানুষের মন-বস্তুটি এমনই উপাদানে গঠিত যে তার মধ্যে আশৈশব

দেশ-প্রেম ঢুকিয়ে দিতে থাক্‌লে দেখা যায় যে শতকরা নিরানব্বই জন শেষটায় বিদেশের প্রতি বিমুখ হ'য়ে ওঠে। তাই ওয়েল্‌সের "আউট-লাইন অফ হিস্‌টরি"-র একটা মস্ত বাণীই এই যে, জগতে অনেকখানি নিষ্ঠুরতা ও বর্ব্বরতার জন্যেই দেশ-প্রেম দায়ী, এবং এইজন্যেই সমস্ত জগতে চিন্তাবীরগণ দেশ-প্রেমের প্রতি ক্রমে ক্রমে বিমুখ হ'য়ে প'ড়েছেন। * আর একটা উদাহরণ নিন। খৃষ্টিয়ানিটি নরক, ড্যামনেশন, ব্ল্যাসফেমি প্রভৃতির উদ্ভাবন ক'রেছিল মানুষকে ধর্ম্মভীরু রাখ্‌তে—নিষ্ঠুরতায় সহজ-পটুত্ব দিতে তো নয়। কিন্তু হ'লে হবে কি; তার পাণ্ডাপুরুত ভারি উৎসাহিত হ'য়ে উঠ্‌ল দেখে যে ভয়ের প্রচারে মানুষ যতটা ধর্ম্মভীরু হয়, তার চেয়ে ঢের বেশি হ'য়ে ওঠে নিষ্ঠুর। ফল হ'ল এই যে খৃষ্টিয়ানিটির পদার্পণের অব্যবহিত পরে জগতে "ঈশ্বরের রাজ্য" না জম্‌কে উঠে, ইনকুইসিশন, হেরেসি, ক্রুসেডের নামে বহুদিন ধ'রে জম্‌কে উঠেছিল নরকের নৃত্য-আসর। সূক্ষ্মবিচারে নিশ্চয়ই বলা চলে যে, এজন্যে দায়ী খৃষ্টিয়ানিটি না, দায়ী—খৃষ্টিয়ানিটির-প্রভাবে-গড়ে-ওঠা মনস্তত্বটি। কিন্তু য়ুরোপের চিন্তাশীল মনীষীদের মধ্যে অনেকেই বলেন (ও ঠিক্‌ই বলেন) যে-এ বিচার হচ্ছে তৈলাধার-পাত্র কিম্বা পাত্রাধার-তৈল-বিচার। তাঁরা খৃষ্টেরই নীতি অনুসরণ ক'রে খৃষ্টিয়ানিটি-রূপ ফলের দরুণ খৃষ্টের ভয়-দেখানো রূপ গাছকে দায়ী করেন। তাঁরা বলেন যে খৃষ্ট যাই ভেবেই কেন না মানুষকে ভয় দেখিয়ে থাকুন না, তাঁর কীর্ত্তিকে বিচার করবার সময়ে সে-কথাকে আমরা খানিকটা অবান্তর ব'লেই গণ্য করব। করার যুক্তি এই যে, যখন দেখা যাচ্ছে যে সমাজের অধিকাংশ মানুষ দুর্ব্বল, ও

---

* ১৯২৭শে রাসেল আমাকে কি সাধে ব'লেছিলেন: "I would die rather than teach patriotism?" রোমাঁ রোলাঁ, বার্ণার্ড শ, আনাতোল ফ্রাঁস, টলষ্টয়, প্রভৃতি সকলেই প্রথমটায় দেশ-প্রেমিক হ'য়ে শুরু ক'রে শেষটায় দেশপ্রেম-পরিপন্থী হ'তে যে বাধ্য হ'য়েছেন সে অনেক দুঃখেই।

ভয় একটা বিষম সংক্রামক ব্যাধি, তখন খৃষ্টের মতন মানুষের কাছে দায়িত্বজ্ঞান আমরা বেশি ক'রেই প্রত্যাশা করব। বলব যে ভয়কে সমাজে চারিয়ে দেবার ফল যে পরিণামে বিষময় হ'য়ে উঠতে বাধ্য, এ কাণ্ডজ্ঞান তাঁর একশোবার থাকা উচিত ছিল। * আশা করি স্বীকার করবেন যে এ যুক্তিটি অকাট্য। আমাদের ব্যবহারিক জীবনে দায়িত্ব-সূত্রের বন্ধন অত্যন্ত বলবান্। আপনি তো আইনজ্ঞ। আইনের একটা গোড়াকার কথা নয় কি যে "A man must be held responsible

* ফুট নোটে রাসেলের কয়েকটা কথা যদি এ সম্পর্কে উদ্ধৃত করি তবে আশা করি ভাববেন না নজীর হিসেবে উদ্ধৃত করছি—কথাগুলি অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ ব'লেই উদ্ধৃত করছি—যেটা রাসেলের লেখার একটা মহা গুণ :

"I do not myself feel that any person who is really profoundly humane can believe in everlasting punishment. Christ certainly as depicted in the Gospels did believe in everlasting punishment, and one does find repeatedly a vindictive fury against those people who would not listen to his preaching—an attitude which is not uncommon with preachers, but which does somewhat detract from superlative excellence."...(সে খবর, খৃষ্টকে খৃষ্টানদের অসহিষ্ণুতার জন্যে দায়ী করা হ'য়েছে খৃষ্ট স্বয়ং অসহিষ্ণুতার দৃষ্টান্তস্থল হ'য়েছিলেন ব'লে?) "I really do not think that a person with a proper degree of kindliness in his nature would have put terrors and fears of that sort into the world......all this doctrine that hell fire is a punishment for sin, is a doctrine of cruelty" (খুব ঠিক্ কথা নয়?—যদিও উদারনৈতিক মানুষ খৃষ্টানদের নিষ্ঠুরতার জন্যে খৃষ্টকে দায়ী করতে বাধা পান—যেমন বিজ্ঞানমুগ্ধ দর্শনের অসহিষ্ণুতার জন্যে বিজ্ঞানকে দায়ী করতে আপনি বাধা পেয়েছেন এবং এ বাধা-পাওয়া সহৃদয় মানুষের যোগ্যও বটে—কিন্তু তাই ব'লে ঐ মনোভাবটিকে তো সত্য-নির্দ্ধারণের অনুকূল বলা চলে না, কি করব বলুন?) "It is a doctrine that put cruelty into the world and gave the world generations of cruel torture; and the Christ of the Gospels...would certainly have to be considered partly responsible for that."—"Why I am not a Christian" মনে হয় রাসেলের এ যুক্তি আপনার ওকালতিকে সম্পূর্ণ খণ্ডন ক'রে ফেলল—তা আপনি স্বীকার করতে রাজী কেন না অনিচ্ছা প্রকাশ করুন।

for any consequences that may be reasonably expected to follow from his actions ?"

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও অবিকল ঐ কথা। তাই বিজ্ঞানের মূল প্রেরণাটি অনিন্দ্য হ'লেই তাঁর দায়িত্ব ঘোচে না—দেখ্‌তে হবে এ মূল প্রেরণার ব্যাভিচার যখন হ'য়েছে, তখন বিজ্ঞানের দায়িত্বজ্ঞান সজাগ ছিল কি না—তিনি প্রোটেষ্ট ক'রেছিলেন কি না। বিজ্ঞান যদি বরাবর শুধু তাঁর ন্যায্য অধিকারের সীমান্ত-রক্ষাতেই মন দিতেন তবে অন্য রাজ্যের সীমান্ত-রক্ষীদের সাধ্য কি তাঁকে দুটো কথাও শোনায়? কিন্তু বৈজ্ঞানিক তা না ক'রে পোপের মতনই অনধিকার-চর্চ্চায় লুব্ধ হ'য়ে উঠেছিলেন; তাঁর উৎসাহী ভক্তবৃন্দ যখন তাঁকে সর্ব্বশক্তিমান্ ব'লে পূজা দিতে ছুটেছিল তখন সে-পূজা সাগ্রহেই গ্রহণ ক'রেছিলেন; যখন বুদ্ধিমান্ মানুষ অন্য সব ভক্তের ধ্যানলোককে মায়া ব'লে ল্যাবরেটরিকেই সপ্তম স্বর্গ ব'লে ধ্যান করতে চেয়েছিল তখন পরম সন্তোষেই তাদের মানসী প্রতিমা হ'তে রাজি হ'য়েছিলেন, মোহান্ত যতক্ষণ বলেন তিনি মন্দির-বিশেষের তত্ত্বাবধায়ক মাত্র, ততক্ষণ তাঁর অন্ন মারে কে? গোল বাধে তখনই যখন তিনি বাঞ্ছাকল্পতরুর গদিতে গিয়ে ব'সে মুগ্ধ ভক্তকে আকারে ইঙ্গিতে জানিয়ে দেন যে এখন থেকে শুধু তাঁর পূজা দিলেই স্বর্গের সীট রিজার্ভ থাকবে। বিজ্ঞানের অভ্যুত্থানের গোড়ার দিক্‌কার ইতিহাসের কি প্রতি পাতায় মেলে না, তাঁর এই মোহান্তবৃত্তি?—তিনি ভরসা দেন নি পাঁচজনকে যে, যতরকম সত্য অনুভব জগতে মেলে, বৈজ্ঞানিক টেষ্ট টিউবের মধ্যে ধরা পড়বেই পড়বে কোনো না কোনো সময়ে? বলেন নি যে, যে-সত্য এ পদ্ধতিতে ধরা না দেবে সে "অসিদ্ধঃ—প্রমাণাভাবাৎ?" এখন, শুধু বিজ্ঞানমুগ্ধ দর্শনকেই তার বিজ্ঞানকে পূজা করার জন্যে গালি পাড়লে তো শুন্‌ব না। জিজ্ঞাসা করব, যখন এ-দর্শন বিজ্ঞানকে পোপের আসনে বসাতে ছুটেছিল তখন তিনি পোপের মতনই সে-পূজা গ্রহণ করেছিলেন

কি না—আওয়ার ফল্‌স প্রিটেন্‌সেস্‌। যে-মনোভাব বিজ্ঞানের মৌন আশ্বাসের উৎকোচে ও বিজ্ঞান-মুগ্ধ দর্শনের অন্ধ ওকালতির সাহায্যে ফেঁপে উঠেছে তার জন্যে শুধু একজনকেই দায়ী করব ও অন্যজনকে দেব নিষ্কৃতি? বিজ্ঞানের প্রশ্রয়ে যে-মনোভাব গত দুই শতাব্দী ধ'রে বহু বুদ্ধিমান মানুষের বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছিল (যে-প্রভাব থেকে সে এখনো সম্পূর্ণ মুক্তি পায় নি—তবে পেতে ব'সেছে এই যা ভরসার কথা) সে হচ্ছে নিছক্ অসহিষ্ণুতার ও অন্ধ সঙ্কীর্ণতার মনোভাব, যাকে ঠাট্টা ক'রে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব বল্‌তেন সেই বাড়ী-পড়ার গল্প জানেন তো? একজন লোক এসে তার বন্ধুকে বলে: "ওহে আমি পথে আস্‌তে আস্‌তে দেখ্‌লাম অমুক বাড়ীটা হুড়মুড় ক'রে প'ড়ে গেল।" বন্ধু তৎক্ষণাৎ উত্তর দিলেন: "দাঁড়াও হে, আগে খবরের কাগজটা একবার দেখি।" ব'লে খবরের কাগজের পাতা উল্টে দেখে বল্‌লেন: "দূর, বাড়ীটাড়ী কোথায় প'ড়েছে? পড়ে নি তো।" সংবাদদাতা আশ্চর্য্য হ'য়ে বল্‌ল: "সে কি হে? আমি যে স্বচক্ষে দেখে এলাম? এই এম্‌নি হুড়মুড় ক'রে—" বাধা দিয়ে বন্ধু বিজ্ঞ হেসে বল্‌লেন: "ও তোমার চোখের ভুল—খবরের কাগজে যখন নেই তখন ও-কথা আদপে বিশ্বাস করলাম না।" গল্পটি ব'লে পরমহংসদেব হেসে বল্‌তেন যে, গুরুবাদ, সমাধি, অতীন্দ্রিয় জগত প্রভৃতির কথা আজকালকার জেণ্টল্‌-মানেরা কি ক'রে বিশ্বাস করবেন? ও-কথা সায়েন্সের খবরের কাগজে লেখে নি যে।

পরমহংসদেবের এ-অভিযোগের উত্তরে কি আপনি ফের বল্‌বেন যে, এর জন্যেও দায়ী বিজ্ঞান নয়, দায়ী বিজ্ঞানমুগ্ধ দর্শন ও বিজ্ঞান-উচ্ছ্বসিত দুর্ব্বল মানুষ? না, এ-ভাবে ও-দুয়ের মধ্যে সীমারেখা টান্‌লেই বিজ্ঞানকে দায়মুক্ত করা সম্ভব? ধর্ম্মের আনুষঙ্গিক গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের জন্যে ভগবান্‌কে তিরস্কার সহ্য করতে হ'য়ে থাকে, তবে বিজ্ঞানের আনুষঙ্গিক

গোঁড়ামি ও চেলা-চামুণ্ডার গোয়ার্ত্তুমির জন্তে বৈজ্ঞানিককেই বা ছেড়ে কথা কইব কেন বলুন ?—বিশেষতঃ, যখন চেলাচামুণ্ডার এ অসহিষ্ণুতাকে বিজ্ঞান একরকম উৎসাহই দিয়ে এসেছে।

আপনার আর একটা কথার বিপক্ষে একটু বিশদ ক'রেই দুটো কথা বলি। আপনি লিখেছেন যে বিজ্ঞান তার জবর-দখলের সূচ্যগ্র ভূমিও ছাড়ে নি। এখানে কি আপনি একটু গোল ক'রে ফেলেন নি? বিজ্ঞান যেটা ছাড়ে নি সেটা তার বুদ্ধির-ওপর-শ্রদ্ধা ও বস্তুজগৎ সম্বন্ধে তথ্যানুসন্ধানে সায়েন্টিফিক পদ্ধতিকে আস্থা। কিন্তু তার আউটলুক নিশ্চয়ই বদ্‌লেছে, তার অনেক অধিকারের ক্ষেত্রকে তার নিশ্চয়ই সঙ্কীর্ণ ক'রে নিতে হ'য়েছে, অনেক বিষয়ে তাকে নিশ্চয়ই বিনয়ী হ'তে হ'য়েছে। "বিজ্ঞানের ট্রাজেডি" তে ব'লেছি যে, বিজ্ঞানের প্রথম অভ্যুত্থানের যুগে বৈজ্ঞানিক মনে ক'রেছিলেন যে এ বাস্তবজগৎ সম্বন্ধে চরম ও পরম জ্ঞান মিল্‌তে পারে শুধু তাঁর বিজ্ঞানের তন্ন তন্ন অনুসন্ধানে—বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির মাপাযোথায়, বিশ্লেষণে, ব্যবচ্ছেদে। প্রকৃতির নানা শক্তি ও তাদের আইনকানুন সম্বন্ধে তথ্য উদ্‌ঘাটন করতে গিয়ে বিজ্ঞান তাঁর অনেকগুলো শক্তিকে কর্ত্তৃত্বাধীনে আনেন। ফলে আসে—যান্ত্রিকতা। মানুষের চোখে বিজ্ঞান তার প্রথম দিক্‌কার এ অদ্ভুত সাফল্যে ধাঁধা লাগিয়ে দেয়। ফলে মানুষ মনে ক'রে বসে (ও বৈজ্ঞানিক সে-বিশ্বাসের প্রশ্রয়ই দেন) যে বিজ্ঞানের ফলে শুধু যে প্রকৃতি দেবীর নানা শক্তিকে কাজে লাগানো যায় ও তাদের ধরণ-ধারণ সম্বন্ধে নানা খবর পাওয়া যায় তাই নয়; জগতের স্বরূপজ্ঞানও ঐ এক বিজ্ঞানের পদ্ধতিতেই মিল্‌তে পারে। কাজেই ধর্ম্ম ও অন্যান্য নানা অনুভূতির জগত নাকচ ক'রে দেওয়াই পন্থা—যেহেতু ও-সব জগত বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির দিক্‌চক্রবালের মধ্যেও আসে না, বৈজ্ঞানিক পরীক্ষায় সাড়াও দেয় না। ভল্‌টেয়ার-প্রমুখ ধর্ম্মবিরোধীদের অনেকখানি ভরসাই মিলেছিল বিজ্ঞানের এই আশাতীত

সাফল্যে ও জাঁক ক'রে-বলায় যে, যা নেই ভারতে তা নেই ভারতে :— অর্থাৎ কি না, বিজ্ঞানের দূরবীণে, দাঁড়িপাল্লায় ও অণুবীক্ষণে যা ধরা না পড়বে তা কুসংস্কার। এক কথায়, এটা স্পষ্ট ক'রে বোঝা দরকার যে বিজ্ঞানের প্রথম সাফল্য জ্যোতিতে মুগ্ধ মানুষ তাকে ঈশ্বরের আসনে বসিয়েছিল ও মনে ক'রেছিল যে জগতকে তার অন্তঃস্থল অবধি দেখ্‌তে যদি কেউ পারে তবে সে বিজ্ঞান।

কিন্তু বিজ্ঞানের প্রথম সাফল্যের মন্ত্রমুগ্ধ অবস্থা কাট্‌তে না কাট্‌তে মানুষ দেখ্‌ল কে বিজ্ঞানের সর্ব্বজ্ঞতার ক্ষমতা তো নেই-ই—জগৎ সম্বন্ধে তার জ্ঞানও একটা বিশেষ ধরণের ওপর-ওপর জ্ঞান। এডিংটন বিজ্ঞানের এই change of frontএর ইতিহাস তাঁর **Nature of the Physical World**এ এত চমৎকার ক'রে দেখিয়েছেন যে ও-বইটিকে ওখানকার বিশেষজ্ঞেরা একখানি epochmaking পুস্তক ব'লে অভিনন্দন করছেন। * তাই তাঁর ও-বইটির দু-একটা স্থল উদ্ধৃত ক'রে দেখাবার চেষ্টা করব যে বিজ্ঞান তার জবর-দখলের অনেকখানি ভূমিই ছেড়েছে এবং এ-ছাড়াটা একটা গুরুতর রকমের ছাড়া ব'লেই বিজ্ঞান মনে করে—আপনি মনে করুন বা না করুন।

প্রথমেই তিনি দেখাচ্ছেন যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি—যাকে এক সময়ে বিজ্ঞান জগতের স্বরূপ জ্ঞানের চরম অর্জ্জন ব'লে ভেবে ব'সেছিল—"is only applicable to symbolic knowledge" বলা যদি একটু বেশিই বলা হয়, তাহ'লেও এটা স্বীকার করতেই হবে যে "the more customary forms of reasoning have been developed for symbolic knowledge only." কারণ, "the intimate knowledge will not submit to codification and analysis; or rather,

* Nature নামক বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকা ও Mind নামক বিখ্যাত দার্শনিক পত্রিকা।

when we attempt to analyse it the intimacy is lost and replaced by symbolism." কাজেই দাঁড়াচ্ছে যে, আধুনিক বিজ্ঞান "most strongly insists, its methods do not penetrate behind symbolism" ব'লে তিনি ঠিকই বলেছেন যে "এইজন্যে চেয়ার টেবিল সম্বন্ধে যে-ধরণের বর্ণনায় আমাদের তৃপ্তি হয়, আমাদের নিজেদের ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধে সে-ধরণের বর্ণনাকে আমরা অসম্পূর্ণ মনে না ক'রেই পারি না, যেহেতু "We have a real and not merely symbolic knowledge of our own nature."

এটা বিজ্ঞানের অনেকখানি ভূমি ছেড়ে-দেওয়া বল্‌তেই হবে। কারণ মনে রাখ্‌বেন, বিজ্ঞান প্রথমটায় মনে করত যে জগতকে তার স্ব-স্বরূপে জানা একতারই এলাকায় পড়ে। আজকের বিজ্ঞান বল্‌ছে যে, না, সেটা তার ভুল হ'য়েছিল, যেহেতু intimate or direct knowledge—যাকে শ্রীঅরবিন্দ তাঁর নানা যৌগিক নিবন্ধে ব'লেছেন knowledge through direct vision and identity—বিজ্ঞানের পদ্ধতিতে মিল্‌তেই পারে না। ও-পদ্ধতিতে মিল্‌তে পারে শুধু প্রতীক-জ্ঞান—symbolic knowledge. বিজ্ঞান বস্তুকে খণ্ডবিখণ্ড ক'রে মলেকিউলে পৌঁছে প্রথমটা হৃষ্ট হ'য়ে ওঠে বুঝি বস্তুকে এতদিনে সে জান্‌ল। কিন্তু ও মা! হঠাৎ দেখা গেল মলেকিউল বস্তুর শেষ কথা নয়—অ্যাটম। বিজ্ঞান এবার আনন্দের হ্রেষারব ক'রে ব'লে উঠ্‌ল:—জান্‌তাম পেতেই হবে—বলিনি, বস্তুর চরম তত্ত্ব বিজ্ঞানে ধরা যাবেই যাবে? না গিয়ে পারে! কাজেই, শুনহ মানুষ ভাই, অ্যাটম জগতে চরম সত্য, তাহার উপরে নাই।" কিন্তু হায়, টমসন রুদারফোর্ড! বৈজ্ঞানিককে তোমরা অতল জলে ফেল্‌লে যে ইলেকট্রন আবিষ্কার ক'রে! ও ইলেকট্রন বস্তুটি কী? কেউ জানে না। বিদ্যুৎপ্রবাহ ওর অঙ্গ যোগে আছে বটে, কিন্তু ওর গতিবিধির সম্বন্ধে একটা গড়পড়তা হিসেব বই আর কিছুই মেলে না—

ওরা এতই অশিষ্ট। কাজেই এডিংটন বল্‌ছেন :—"আজকালকার বিজ্ঞানে ইথার ইলেক্‌ট্রন সম্বন্ধে প্রশ্ন করলে বিজ্ঞান আর আগেকার মতন বিলিয়াড বল বা গাড়ীর চাকার মতন স্থূল প্রত্যক্ষ কোনো মডেলের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ ক'রে ব্যাপারটা বোঝাতে যাবেন না—he will point instead to a number of symbols and a set of mathematical equations which they satisfy." পুরোনো বিজ্ঞানের জাঁকালো-ব্যাখ্যায়-অভ্যস্ত মানুষ এ ধরণের ব্যাখ্যায় একটু নিরাশ হ'য়েই যখন জিজ্ঞাসা করেন "What do the symbols stand for?" তখন "the mysterious reply is given that physics is indifferent to that." এক কথায়, আজকালকার বিজ্ঞান বলা ছেড়ে দিয়েছে যে কোনো কিছুর স্বরূপ-জ্ঞানই তার লক্ষ্যস্থল, যেহেতু "it has no means of probing beneath symbolism." কাজেই, যদিও আগেকার বিজ্ঞান জগৎকে বোঝবার জন্তে নানা মডেল প্রভৃতি দিয়ে ব্যাপারটা বিশদ করতে চেষ্টা পেত, আজকালকার বিজ্ঞান বস্তুর স্ব-স্বরূপ জ্ঞান আহরণের হাল ছেড়ে দিয়ে বল্‌ছে : "To understand the phenomena of the physical world it is necessary to know the equations which the symbols obey but not the nature of that which is symbolised."

এখানে 'not the nature of that which is symbolised' কথাটির মধ্যেই বিজ্ঞানের change of front এর গূঢ় মর্ম্ম নিহিত। কারণ যে-মুহূর্ত্তে বিজ্ঞান বলা ছেড়ে দেয় যে, কোনো কিছুরও স্ব-স্বরূপ জ্ঞান তার সাধ্যের অতীত, সে-মুহূর্ত্তে সে অত্যন্ত বিনয়ী হ'য়ে পড়ে। এটা বিজ্ঞানের দাবী-দাওয়ার দিক্ থেকে একটা গভীর পরিবর্ত্তন; যেহেতু এ-স্বীকারোক্তির ফলে, বৈজ্ঞানিকের গোটা আউট-লুকই যাচ্ছে বদ্‌লে। প্রত্যয় জগতে এ-আউটলুক বদলের ফল নির্ণয় করতে গিয়ে এডিংটন খুব

খাঁটি কথাই লিখেছেন : " Perhaps the most essential change is that we are no longer tempted to condemn the spiritual aspects of our nature because of their lack of concreteness." যেহেতু " We have travelled far from the stand point which identifies the real with the concrete." সুতরাং, আধ্যাত্মিকতা বা মিস্‌টিসিস্‌মকে অত্যাধুনিক বিজ্ঞান আর ছায়াময় অবাস্তব বলে ডিশ্‌মিশ্‌ ক'রে দিতে পারে না—কেননা তাহ'লে (যেমন এডিংটন আর এক যায়গায় বলেছেন) সব আগে গঙ্গাযাত্রা করাতে হয় ঐ ইলেক্‌ট্রনকে, যার সবটাই ছায়াবাজি। *

এই জন্যে আমার মনে হয় আপনি কোপর্নিকসের উদাহরণ দিয়ে একটু ভুল ব'লেছেন যে বিজ্ঞান যখন এখনো পৃথিবীকেই সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরাচ্ছে, সূর্য্যকে পৃথিবীর চারদিকে না,—তখন প্রমাণ হ'য়ে গেল যে তার জবর দখলের কিছুই সে ছাড়ে নি। আর পৃথিবীকে সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরাবার কথা নিয়ে আপনি এত জাঁক করাতে একটা আপত্তি করবার

* এডিংটন তাঁর স্নিগ্ধ রসিকতার সঙ্গে বৈজ্ঞানিকের বর্ত্তমান সঙ্কটের বিষয়ে বেশ লিখেছেন : When Dr. Johnson felt himself getting tied up in argument over " Bishop Berkeley's ingenious sophistry to prove the non-existence of matter and that everything in the universe is merely ideal," he answered, striking his foot...against a large stone till he rebounded from it, "I refute it thus." Just what that action assured him of is not very obvious ; but apparently he found it comforting. And to-day the matter-of-fact Scientist feels the same impulse to recoil from these flights of thought back to something kickable, although he ought to be aware by this time that what Rutherford has left us of the large stone is scarcely worth kicking. " Nature of the Physical world."

কথা মনে জাগল। আমি রিলেটিভিটির ব্যাপারটা ভাল বুঝি না—সে গণিত জ্ঞান আমার নেই। কিন্তু এ কথা বুঝি—যেটা রাসেলের রিলেটিভিটি সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ বইয়ের গোড়াতেই দেখতে পাবেন—যে সব গতিই আপেক্ষিক হওয়ার দরুণ অত্যাধুনিক বিজ্ঞান-অনুসারে পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে বলাও যতখানি সত্য, সূর্য্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে বলাটাও অবিকল ততখানিই সত্য। কথাটা প'ড়ে আমার প্রথমটায় শক্ লেগেছিল; কিন্তু একটু ভেবে দেখলেই দেখা যায় কথাটা মিথ্যা নয়। কাজেই দেখছেন আধুনিক বিজ্ঞান জোর ক'রে বলে না যে সূর্য্য পৃথিবীর চারদিকে ঘুরছে না। এখনো যদি আপনি এ বিষয়ে পরাজয় স্বীকার না করেন তবে নাচার।

হোয়াইটহেড সাহেব সম্বন্ধে আপনি যা ব'লেছেন, সে সম্বন্ধেও আমার কিছু বক্তব্য আছে। উনি ধর্ম্ম বলতে নিছক আধ্যাত্মিকতা বোঝেন না, এ-কথা ওঁর লেখা যে-ই পড়বে সে-ই বলবে। কাজেই উনি আর অধ্যাত্মবাদী ধর্ম্ম বলতে ঠিক এক বস্তু বোঝেন না, আপনার এ-কথার মধ্যে খানিকটা সত্য আছে। কিন্তু তবু কথাটাকে সম্পূর্ণ সত্য বলাও চলে না। বিজ্ঞানের ক্রম-পরিণতির ফলে ধর্ম্মের খাতায় লাভের পাতারই অঙ্কপাত বাড়তে থাকবে, এ-কথা যখন উনি বলেছেন, তখন ধর্ম্মের আধ্যাত্মিক ও খানিকটা দার্শনিক দিকই যে তাঁর উদ্দিষ্ট, আপনার এ-কথা সত্য। কিন্তু তাই ব'লে অপরোক্ষ অনুভূতির জগতে ধর্ম্মের অবদানের মূল্য সম্বন্ধে যে উনি একটুও সচেতন নন বা ধর্ম্ম বলতে অপরোক্ষ অনুভূতিকে, একেবারে অপাংক্তেয় ক'রে তবে কথা ক'ন, এ-কথা বললে একটু বেশি বলা হবে না কি? তাই যদি হ'ত, তা হ'লে কি ওঁর **Religion in the Making** বইখানিতে উনি লিখতে পারতেন, যে, ধর্ম্মের একটা মস্ত কাজ হচ্ছে মানুষের একাকিত্বের সমস্যা সমাধান করা? যখন আধ্যাত্মিকতারও একটা মস্ত কাজ এই, তখন শুধু ওঁর Science

and the Modern World থেকে কয়েকটি লাইন উদ্ধৃত ক'রে ধর্ম্ম সম্বন্ধে ওঁর মতামতকে অতটা হাল্‌কা ক'রে দিয়ে ওঁর ওপরে আপনি একটু অবিচার করেন নি কি?

তবে হোয়াইটহেড সাহেব সম্বন্ধে আপনার কটাক্ষ পূর্ণভাবে সমর্থনীয় না হ'লেও এ বিষয়ে আসল বক্তব্যটি আপনার খুবই খাঁটি। সেটা এই যে, ওদের দেশের অনেক মহারথীই ধর্ম্ম বল্‌তে ঠিক্ আধ্যাত্মিকতা বোঝেন না, এবং আধ্যাত্মিকতা বল্‌তে প্রত্যক্ষানুভূতির বড়-একটা ধার ধারেন না। অন্ততঃ এ-কথা ওঁদের লেখা পড়লে মনে না হ'য়েই পারে না। আমি এইরূপ একজন প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম প্রবণ বৈজ্ঞানিকের একটি বই শ্রীঅরবিন্দকে পাঠিয়েছিলাম কিছুদিন আগে। প'ড়ে শ্রীঅরবিন্দ আমাকে লেখেন:—
The part about the changed attitude of modern science to its own field of discovery is interesting. The latter part of this book about religious experience I find very feeble; it gives me the impression of a hen scratching the surface of the earth to find a scrap or two of food—nothing deeper.

তাই এ-ক্ষেত্রে আপনার সঙ্গে আমার মতের মিল আছে।

কিন্তু আপনি চার্ব্বাক ও উদয়নাচার্য্যের ও-অবান্তর উদাহরণটি দিলেন কেন বলুন তো? আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, রাসেলের Is Science Superstitions প্রবন্ধটি আপনি আদৌ পড়েন নি। কারণ পড়লে এত বড় ভুল কথা কিছুতেই লিখ্‌তে পারতেন না যে, হিউম সম্বন্ধে রাসেলের উক্তি হচ্ছে "ছদ্ম উদয়নী বিদ্রূপ"। রাসেল ও-প্রবন্ধটিতে হিউমকে বিদ্রূপ করার কথা স্বপ্নেও ভাবেন নি, বিজ্ঞানের প্রতিপত্তি-হ্রাসের দুঃখেই তিনি ভেবে-সারা। তাঁর দুঃখ এই (যে কথার "বিজ্ঞানের ট্র্যাজেডি" তে আমি একটু ইঙ্গিত ক'রে দিয়েছিলাম) যে "Naturally people wish to

keep the pleasant aspect of science without the unpleasant aspect ; but so far the attempts to do so have broken down." এর মধ্যে বিদ্রূপের তো বাষ্পও খুঁজে পাওয়া যায় না। আর একে প্রকাশ্য অশ্রুপাত, বই আর কি বল্‌ব? যে:—"If we emphasize the fact that our belief in causality and induction is irrational, we must infer that we do not know science to be true." আমার মনে হচ্ছে—মাফ করবেন—যে বিজ্ঞানের প্রেরণাকেও মূলতঃ pre-scientific বা irrational ব'লে মেনে নিলে যে ওদের বৈজ্ঞানিক দর্শনের ইমারতটি কী ভাবে টলমল ক'রে উঠ্‌তে বাধ্য, সেটা আপনি ঠিক্ ধরতে পারেন নি। এতদিন ধ'রে বৈজ্ঞানিকরা যুক্তি ও বুদ্ধিকেই তাঁদের বিজ্ঞানের একমাত্র মূল প্রেরণা ব'লে মনে ক'রে এসেছেন। আজ হঠাৎ তাঁরা আবিষ্কার করবার কিনারায় এসেছেন যে, যুক্তিতে বিশ্বাসও খানিকটা অযৌক্তিক—ও-ও অন্ধ বিশ্বাস। * এতে বৈজ্ঞানিকের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির বদল না হ'লে পারে (যে কথা আপনার অন্যতম প্রতিপাদ্য) কিন্তু বিজ্ঞানের দার্শনিক ভিত্তির মধ্যে যে ভূমিকম্প হ'য়ে যায়। আমার সত্যিই একটু আশ্চর্য লেগেছে যে এ, সহজ কথাটা ধরতে না পেরে আপনার মতন লোক চার্ব্বাকের অমন অপ্রাসঙ্গিক দৃষ্টান্তটি এমন যায়গায় ঢুকিয়ে দিলেন কি

* I think we should not deny validity to certain inner convictions, which seem parallel with the unreasoning trust in reason which is at the basis of mathematics, (কথাটা উদ্বেগজনক না হ'য়ে পারে?) with an innate sense of the fitness of things which is at the basis of the science of the physical world (এটাও তাহ'লে অন্ধবিশ্বাসের বা ভরসার কোঠায়ই পড়ছে মনে রাখ্‌বেন) and with an irresistible sense of incongruity which is at the basis of the justification of humour.

(Nature of the Physical World...Eddington.)

ক'রে? মনে প'ড়ে যায় যে, পিকুইক পেপাস-এ মিষ্টার ওয়েলারের 'সারকাম্‌ভেণ্ট' কথাটির ওপর বিষম প্রীতির কথা—যার প্রয়োগ তিনি সর্ব্বত্রই কাম্য মনে করতেন ও পুত্র স্যাম ওয়েলারকে পই পই ক'রে ব'লেছিলেন ও-মর্ম্মস্পর্শী কথাটি তার প্রেমপত্রে ঢুকিয়ে দিতে!

কিন্তু, এ তো গেল আমাদের গরমিলের কথা। লিখ্‌তে ব'সে এ অমিলের দিক্‌টাই ফেঁপে উঠ্‌ছে বটে—কিন্তু বস্তুতঃ আপনার ও আমার মধ্যে যে মিলই বেশি, এ-কথা আরও বড় ক'রে ব'লে রাখা দরকার। নইলে পাঠকের মনে এ ভুল ধারণাটি জন্মে যাওয়া স্বাভাবিক যে আপনি ও আমি বুঝি 'যুদ্ধং দেহি' ব'লেই প্রবন্ধাঙ্গনে অবতীর্ণ।

আপনার সঙ্গে আমার সব-চেয়ে বড় মিল এই যে আপনি স্বীকার ক'রেছেন যে আধ্যাত্মিক অনুভূতির "stubborn fact যার মন অনুভব ক'রছে, ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা তার কাছে প্রমাণের বিষয় নয়। তার ভিদ্যতে হৃদয় গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।"

কথাটা ঠিক্, কেন না ও-দুই একেবারে আলাদা জগৎ। কাজেই বিজ্ঞান যতক্ষণ তার নিজের ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতে চারণ ক'রে বেড়ায়, অতীন্দ্রিয় জগতের এলাকায় ঢুঁ মারতে না যায়, ততক্ষণ তার অন্ন মারে কে? গোল বাধে তখনই, যখন বৈজ্ঞানিক ব'লে বসেন যে বিজ্ঞান-অধিগম্য জগতের মতন সব জগতই বুদ্ধির মাপকাটি দিয়ে পরিমাপ্য এবং এক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি সব রহস্যেরই তলস্পর্শ করতে সক্ষম। এ-আস্ফালন অসার এইজন্যে যে জীবজগতের নানা শক্তি নিজের রাজ্যে অপ্রতিহত-প্রভাব হ'লেও অপরের রাজ্যে ক্লীব—জলে বাঘ ডাঙায় কুমীরের মতন। যেমন ধরুন ইন্‌ষ্টিংট। কে না জানে, তার নিজের ক্ষেত্রে সে বুদ্ধির চেয়ে হীন হওয়া দূরে থাকুক, বুদ্ধিকে বহুগুণে ছাড়িয়ে যায়।*

---

* শ্রীঅরবিন্দ এই কথাটি বেশ চমৎকার ক'রে বলেছেন তাঁর Psychology of Social Development-এ পশু-জগত সম্বন্ধে:

কিন্তু, তাই ব'লে ইনষ্টিংটকে যে বুদ্ধির রাজসিংহাসনে বসালে "মহতী বিনষ্টি" হয়ই হয়, এটা মানুষ বার বার ঠেকে শিখেছে, এবং সেইজন্তেই প্রকৃতিদেবী তাঁর বিকাশ লীলায় মুগ্ধ হ'য়ে ঐখানেই দাঁড়ি টান্‌তে রাজি হ'ন নি বুদ্ধির শত বিপদ সত্ত্বেও তাকে গ'ড়ে তুল্‌তেই হ'য়েছে। এবার বুদ্ধির পালা। তাই নিজের রাজ্যে তাকে সুপ্রতিষ্ঠ করবার প্রয়াস যতই কেন প্রশংসনীয় হোক্ না, তার অনধিগম্য রাজ্যের খবর নিতে ছুট্‌তে হবে বুদ্ধির অতীত শক্তিনিচয়কে। তাই মানুষ আজ বুদ্ধিকে ছাড়িয়ে উঠ্‌তে চাইছে; মনুষ্যত্বের শত গৌরব, শত লোভনীয় হাতছানিকেও অবহেলা ক'রে ছুট্‌তে চাইছে মানুষের অনধিগম্য রাজ্যের জন্তে—দেবত্বের জন্তে—মর্ত্ত্যে অমৃত-নিস্যন্দিনী গঙ্গাধারাকে অবতারণ করাবার জন্তে। তাই মহাকবির চিরন্তনী গীতি—"ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া"—"ক্ষুরধারের মতন সুতীক্ষ্ণ দুর্গম পথকেই" একান্ত ভাবে বরণ করতে হবে; তাই উচ্চাশী ঋষি আবহমানকাল গেয়ে এসেছেন—"নাল্পে সুখমস্তি," "অল্পে সুখ নেই"; তাই দ্রষ্টা বীরের যুগযুগান্তের ঘোষণা: "Der Mensch ist etwas das überwunden werden soll"—"মানুষকে তার মনুষ্যত্বের গণ্ডী কাটিয়ে উঠ্‌তেই হবে।" এতে অধিকাংশ মানুষই হয় ত এখন রাগ করবে, ক্ষেপে উঠ্‌বে, কারণ লব্ধ সম্পদকে পায়ে ঠেলে অলব্ধের অভিলাষী মানুষ জগতে বিরল; কিন্তু বিপুল উচ্চাশার বাণী ত চিরন্তনীর

"The ease, splendour, fine normality, beauty, self-satisfaction of the sub-human life of Nature up to the animal is due to its entire obedience to this instinctive automatic urge. It is a vague sense of this truth and of the very different and in this respect inferior character of human life which makes the thinker when dissatisfied with our present conditions speak of life according to Nature as its remedy."

বাণী নয়—সে যে চির-অতৃপ্তির ইতিহাস। সাধে কি স্বপ্নদর্শী ভাবুক গেয়েছিলেন "Ich liebe die grosse Verachtenden, weil sie die grosse Verehrenden sind!" "আমি ভালবাসি সেই-চির-অতৃপ্ত মানুষকে যে বিপুলভাবে ঘৃণা করতে জানে কুয়ায়ত্ত স্বল্প সুখ, স্বল্প শান্তিকে, কারণ সেই বিপুলভাবে শ্রদ্ধা করতে জানে অনাগত বারতাকে, অপ্রুদিত জ্যোতিকে।" এ-আবাহন যুক্তির বুদ্ধির তর্কবিচারের সাধ্যায়ত্ত তো নয়—এ যে বীর মনের বহুদিনের স্বপ্ন, কবিপ্রাণের যুগ যুগের উচ্চাশা, ঋষি-হৃদয়ের আদিম প্রেরণা ;—এ-মতি তো তর্কাতর্কির বিষয়ীভূত নয়—"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া"—উপায় কি? উচ্চতর ধর্ম্মকে নিম্নতর জীবের স্বধর্ম্মে পরিণত করার উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে তার চিরদিনের প্রণোদনা। তাই বুদ্ধি-বিজ্ঞান-যুক্তি, তর্ক বিচার-বিবেচনা প্রভৃতির দানের মূল্য অস্বীকার না ক'রেও মানুষ এ-কথা বলার অধিকারী যে, ও-সবের মহিমা যত অকাট্যই হোক্ না কেন ওতেই চিরতুষ্ট থাকলে চল্‌বে না। ওদেরও ছাড়িয়ে যাবার ইষণা যে মানুষের জীবন ধারণের প্রেরণার মতনই দুর্ব্বার, স্বয়ংসিদ্ধ—যেমন ইন্‌ষ্টিংটকে ছাড়িয়ে যাওয়ার প্রেরণা ছিল মানুষেতর প্রাণীর সহজ কামনা ও প্রাণের দাবী। বুদ্ধি-যুক্তি রাজ্যের চেয়েও উর্দ্ধতর রাজ্যের পানে মানুষের এই চির-তৃষিত দৃষ্টিকে সম্পূর্ণ মরীচিকার পেছনে ছোটা, আকাশ-কুসুম, কবি-কল্পনা বল্‌লেও শুন্‌ব না—কারণ বুদ্ধির অতীত লোকের রাজ্যের ও শক্তির কোনো আভাষই যে মানুষ পায় নি তা নয়। যদি না পেত, তাহ'লে না সৃষ্টি হ'ত ত্যাগের, প্রেমের, করুণার, তপস্যার, বিশ্বাসের, শ্রদ্ধার অক্ষয় সম্পদ্, না দেখা মিল্‌ত কাব্য সঙ্গীত চিত্রকলার আনন্দ-লোকের। কেন না, বলাই বেশি এ-সব প্রবৃত্তি ও প্রেরণাই বুদ্ধিও যুক্তি-নিরপেক্ষ। শুধু তাই না, বুদ্ধি অনেক কিছু গভীর উপলব্ধিরই, অনুভূতিরই দিশা পায় না :—

"The limitations of reason become very strikingly;

very characteristically, nakedly apparent when it is confronted with that great order or psychological truths and experiences which we have hitherto kept in the background—the religious being of man and his religious life. Here is a realm at which the intellectual reason gazes with the bewildered eyes of a foreigner who hears a language of which the words and spirit are unintelligible to him and sees everywhere forms of life and principles of thought and action which are absolutely strange to his experience. He may try to learn this speech and understand this strange and alien life, but it is with pain and difficulty, and he cannot succeed unless he has, so to speak, unlearned himself and become one in spirit and nature with the natives of this celestial empire. Till then his efforts to understand and interpret them in his own language and according to his own notions and at the worst in a gross misunderstanding and deformation; they sound to men of religious experience like the prattle of a child who is trying to shape into his own habitual notions the life of adults or the blunders of an ignorant mind which thinks fit to criticise patronisingly or adversely the labours of the profound thinker or the great scientist. At the best even they extract and account for only the externals of the things they attempt to explain; the spirit is missed, the inner matter is left out and for that reason even the

account of the externals is without real truth and has only an apparent correctness."

ভাবার্থ: "বুদ্ধির যে সীমা কোথায় সেটা অতি নগ্নভাবে ধরা পড়ে যখন তাকে আধ্যাত্মিক জগতের সত্য ও উপলব্ধি-সমূহের সাম্‌নাসাম্‌নি দাঁড় করানো যায়—যে জগতকে আমরা এতদিন ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আনি নি। এই একটি জগতের সাম্‌নে পড়লে বুদ্ধির যুক্তি-তর্ককে বাক্যমূঢ় হ'য়ে তাকিয়ে থাক্‌তে হয়, যেন সে কোথাকার কোন্ পরদেশী, যে না বোঝে এখানকার ভাষা, না বোঝে তার নিগূঢ় অর্থ। এ-জগতের সংস্পর্শে সর্ব্বত্রই জীবনের এমন সব রূপ, চিন্তার ও কর্ম্মের এমন সব তত্ত্বের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ ঘট্‌তে থাকে যা তার অভিজ্ঞতায় একেবারেই চৈনিক হেঁয়ালী। অবশ্য সে এই ভাষা শিখ্‌বার ও এই অচেনা অজানা জীবন বুঝবার চেষ্টা করতে পারে; কিন্তু তাতে প্রতি পদে তার বাধা ও বেদনা বাজে। এ চেষ্টা তার বিড়ম্বনা যদি না সে আপন গভীর শিক্ষাদীক্ষা নিঃশেষে ভুলে গিয়ে এই অমৃতলোকের অধিবাসীদের সঙ্গে ধর্ম্মে ও প্রকৃতিতে একীভূত হ'তে শেখে। অন্যথা এ-জীবন এ-জগতকে তার নিজের ভাষা ও ধারণা অনুসারে ব্যাখ্যা করবার প্রয়াস একটা প্রকাণ্ড ভুল বোঝা ও বিকৃতিতে পর্য্যবসিত হ'তে বাধ্য। আর এ-প্রয়াসের আধ-আধ বুলি আধ্যাত্মিক জ্ঞানীদের কানে শোনায় যেন বালভাষিতের মতন, শিশু-জীবনের স্বভাব-সুলভ ধারণার ছাঁচে পূর্ণবয়স্কের জীবনকে ঢালাই করবার প্রযত্নের মতন, গভীর ভাবুক বা শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিকের জীবনব্যাপী সাধনাকে মূর্খের মুরুব্বিয়ানা চালে সমালোচনা-করতে-যাওয়ার মতন।" *

এ-ধরণের কথা শুন্‌লে প্রথমটায় বুদ্ধি-সর্ব্বস্ব মানুষের চটে ওঠা আশ্চর্য্য নয়,—(আমার একটি বুদ্ধিমান বন্ধু সুপ্রামেণ্টাল জগতের নাম শুন্‌লেই

* শ্রীঅরবিন্দের Psychology of Social Development-এর ত্রয়োদশ অধ্যায় থেকে বন্ধুবর শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক অনূদিত।

খাপ্পা হ'য়ে ওঠেন)—কারণ কোনো-কিছু জানি না এটা স্বীকার করতে আমাদের অহমিকায় আঘাত লাগে। কিন্তু প্রতি নূতন সত্য, নূতন উপলব্ধি, নূতন তত্ত্বই প্রথমটায় মানুষকে আঘাত ক'রেই সচেতন ক'রেছে। "নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়," এর উপায় কি বলুন? মুস্কিলই যে ঐখানে যে এ জগত "নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্তুং শক্যো ন চক্ষুষা"— "এ জগত বাক্য মন দর্শনের অতীত।" শ্রীঅরবিন্দ তাঁর অনুপম ভঙ্গীতে তাই লিখেছেন:—

"The mind and the intellect are not the key. They can only trace out and revolve in a circle of half-truths and uncertainties. But in the mind and life, in all the action of the intellectual, the æsthetic, the ethical, the dynamic and practical, the emotional, sensational, vital, physical being, there is that which sees by identity and intuition and gives to all these things such truth and such certainty and stability as they are able to compass. Obscurely we are now beginning to see something of this behind all our science and philosophy and all our other activities But as long as it has to work for the mind and life and not for itself, to work in their forms and not by its own spontaneous light, we cannot make any great use of this discovery. Man's road to supermanhood will be open when he declares boldly that all he has yet developed, including the intellect of which he is so rightly, yet so vainly proud, are now no longer sufficient for him, and that to uncase, discover, set free this greater power

within shall be hence-forward his great preoccupation. Then will his philosophy, art, science, ethics, social existence, vital pursuits be no longer an exercise of mind and life, for themselves, in a circle, but a means for the discovery of a greater Truth behind mind and life and the bringing of its power into our human existence. We shall be on the right road to become ourselves, to find our true nature, to live our true, divine existence, in our real and divine being."

ভাবার্থ:—"মন ও বুদ্ধি আধ্যাত্মিক জগতের শ্রেষ্ঠ দিশারী নয়। এরা যা পারে, সে হচ্ছে একটা অর্দ্ধ-সত্যের ও অনিশ্চয়তার বৃত্ত এঁকে তারই মধ্যে চক্রাকারে আবর্ত্তন করতে। কিন্তু মানুষের মন ও প্রাণ, বুদ্ধি ও সৌন্দর্য্যজ্ঞান, নীতিবোধ ও গতিধর্ম্ম, ব্যবহারিক কর্ম্ম ও ভাব প্রবণতা, ভোগ-লোলুপতা ও শারীর চেতনা এ সবের মধ্যেই আছে সেই পরম চেতনা—যার দৃষ্টি সকল সৃষ্টির স্বরূপের সঙ্গে একাত্মতার ফল, এবং এই চেতনাই মন প্রাণ বুদ্ধি ইত্যাদির প্রত্যেককে দান করছে ততটা সত্য, ততটা স্থিতি, ততটা প্রতিষ্ঠা, যতটা তারা প্রত্যেকে ধারণ করতে সক্ষম। আমাদের সকল বিজ্ঞান, সকল দর্শন এবং সকল কর্ম্ম-প্রচেষ্টার পিছনে এই সত্যটিরই আভাষ আমরা সবে আব্‌ছা আব্‌ছা ভাবে পেতে আরম্ভ ক'রেছি। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত এই চেতনাকে মনের ও প্রাণের পরিচর্য্যায় রত থাকতে হবে, যতদিন পর্য্যন্ত সে নিজের স্বতঃস্ফুরিত আলোকের মধ্যে দিয়ে চল্‌তে না শিখ্‌বে—ততদিন আমরা আমাদের এই আবিষ্কারকে কোনো বড় কাজেই লাগাতে পারব না। মানুষে অতিমানুষ হবার পথ খুলে যাবে তখনই, যখন সে নির্ভীক কণ্ঠে ঘোষণা করবে যে, এতদিন পর্য্যন্ত সে যা গ'ড়ে তুলেছে, আয়ত্ত ক'রেছে (এমন কি বুদ্ধি

পর্য্যন্ত—যার জন্যে সে ন্যায়তঃই, এবং কতকটা অবোধের মতনও বটে, গর্ব্ব অনুভব করে) তা আর তার পক্ষে যথেষ্ট নয়, এবং তার নিজের মধ্যকার বৃহত্তর শক্তিকে মুক্ত করাই হবে তার পরম ধ্যান, চরম স্বপ্ন।" *

এই যে সত্য, এই যে উপলব্ধি, এই যে চেতনা মানুষকে আবহমান কাল অনাগতের দিকে ঠেল্‌ছে, এ কী কোনো যৌক্তিকতার প্রেরণা হ'তে পারে? এ যে একটা গভীর নিথর প্রেরণা যা যুক্তির ধার ধারে না, ধারতে পারে না, কেন না যুক্তিতে সে বিধৃত নয়, তাতেই যুক্তি বিধৃত। সে ধ্রুব, করায়ত্তকে ছাড়ে অনাগতের আবাহনে—তার অভয় দেবতারই অঙ্গুলি-নির্দ্দেশে। নীটশের ভাষায় বল্‌তে গেলে বলা যায়, সব অধিগত সম্পদকে সে ছাড়ে কারণ সে জানে যে "Um die Erfinder von neuen Werthen dreht sich die welt"—"নূতনের পূজারীকেই বিশ্ব প্রদক্ষিণ করে" এবং এ পূজারীর পূজোপচার যে যুক্তি নয়, বুদ্ধি নয়, তর্ক নয়, তা বলাই বাহুল্য।

এই সত্যটি আজকের দিনে যে বৈজ্ঞানিকেরাও খানিকটা স্বীকার করতে আরম্ভ ক'রেছেন, এটা বর্ত্তমান যুগের একটা শুভ চিহ্ন। কাজেই—(ফের দেখ্‌ছেন?)—আপনি যে ব'লেছেন বিজ্ঞান তার জবর-দখলের একটুও ছাড়েনি, সে কথটা সত্য নয়। বেশি কথা কি, ত্রিশ বৎসর আগেও কি বিজ্ঞান জগতের কোনো মহামহোপাধ্যায়ের মুখে এ-ধরণের কথা কল্পনা করা যেত?—

"We all know that there are regions of the human spirit untrammelled by the world of physics. In the mystic sense of the creation around us, in the expression of art, in a yearning towards God, the soul grows upward

* শ্রীঅরবিন্দের Psychology of Social Development-এর বাবিংশ অধ্যায় থেকে বন্ধুবর শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক অনূদিত।

and finds the fulfilment of something implanted in its nature. The sanction for this development is within us, a striving born with our consciousness or an Inner Light proceeding from a greater power than ours. Science can scarcely question this sanction." *

বিজ্ঞানের এ-সুমতি, এ-বিনয় সব দিক্ দিয়েই কাম্য। এতে শুধু বিজ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা ঘোচে ব'লেই না—এতে ক'রে শ্রদ্ধার মধ্যে দিয়ে পরস্পরের উপলব্ধি ও কীর্ত্তি থেকে লাভ করা মানুষের পক্ষে সহজ হ'য়ে ওঠে ব'লেও বটে। মানুষের বোঝবার সময় এসেছে যে জৈব-লীলার বিপুল সৃষ্টিছন্দে নানা শিল্পীরই কলাকারুর প্রয়োজন আছে, নানা সত্যানুসন্ধীরই অবদানের মূল্য আছে, নানা পুজারীরই আরাধনার সার্থকতা আছে। ইতি।

ভবদীয়

শ্রীদিলীপকুমার রায়।

* The Nature of the Physical World...Eddington.

বীরবলের পত্র। *

(১)

Like most people, I do not myself understand physics, and I never shall. But no one can read the books of Professor Eddington without feeling his imagination profoundly stirred.

G. Lowes Dickinson.

So much in praise of science. It does not follow that we must adopt the very poor philosophies, which scientific men have constructed : the notion that the real is what can be weighed and measured, and that our higher interests are a kind of luminous haze floating above the real world and unable to affect it at all, is very bad philosophy, and theology is quite right to protest against it. It would leave us with no art, no religion, and no science either. The eternal and absolute values are at least as much parts of reality, as atoms and electrons.

Dean Inge.

শ্রীমান দিলীপকুমার রায়, শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্তকে, " বিজ্ঞানের স্বমতি " শীর্ষক যে খোলা চিঠি লিখেছেন, এবং যে পত্র 'ভারতবর্ষে'র অগ্রহায়ণ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে, সে চিঠির খোলা-জবাব গুপ্ত মহাশয়ই

---

* ভারতবর্ষ, চৈত্র, ১৩৩৭।

দেবেন; কারণ, উক্ত পত্রের উত্তরে তাঁর নিশ্চয়ই কিছু বলবার আছে, অন্ততঃ কৈফিয়ৎ হিসেবে। আর সে কৈফিয়ৎ তিনি সন্তোষজনকরূপেই দিতে পারবেন।

এ বিষয়ে আমারও একটি কথা বলবার আছে। সে কথাটি এই: উক্ত চিঠিতে দিলীপকুমার আলোচনা বিষয়ান্তরে নিয়ে গিয়েছেন। এ আলোচনার বিষয় আর যাই হোক্, আমাদের ব্যক্তিগত মতামতের দ্বন্দ্ব নয়। তা যে নয়, তা পরিষ্কার করে বোঝাতে হলে এই সব খোলা চিঠি চাপাটির জন্ম-কথা বলা প্রয়োজন। আমি সংক্ষেপে এ আলোচনার পূর্ব্ব-ইতিহাস বিবৃত করছি।

গত বৎসর বোধহয় কার্ত্তিক মাসের উত্তরা-পত্রিকার মারফৎ, শ্রীমান দিলীপ বীরবলের বরাবর একটি দীর্ঘ খোলা চিঠি পাঠান। সে চিঠিতে তিনি এ যুগে বিজ্ঞানের ট্রাজেডির ব্যাখ্যান করেন। আজকাল যাকে নব ফিজিক্স বলে, তা যে Newtonএর প্রবর্ত্তিত সনাতন ফিজিক্স-এর ধাত বদলে দিয়েছে, এই ঘটনাকেই শ্রীমান দিলীপ বিজ্ঞানের ট্রাজেডি মনে করেন। এ চিঠির কি উত্তর দেব, তা' আমি প্রথমে ভেবে পাইনি।

যাকে বলে নব-ফিজিক্স, তার সর্ব্ব-প্রধান কথা দুটি হচ্ছে quanta ও relativity। এখন বীরবল যদি এ দুটি কথা নিয়ে কোনরূপ বাগ্‌বিস্তার করেন, তা'হলে তাঁর বৈজ্ঞানিক বন্ধুরা নিশ্চয়ই বলবেন যে—এই হচ্ছে বীরবলের চূড়ান্ত রসিকতা। শুনতে পাই যে পরা-গণিতের পারগামী না হলে, ও দুই শব্দের অর্থ ও মর্ম্ম গ্রহণ করা অসম্ভব। যাঁরা পরা-গণিতের মুখ্য আচার্য্য, তাঁদের কাছেও না-কি ও অঙ্ক অসহ্য। শ্রীমান দিলীপের দার্শনিক গুরু Bertrand Russell বলেছেন যে, যে-গণিতের উপর Relativity প্রতিষ্ঠিত, সেই tensor calculus হচ্ছে intolerably technical।

অপরপক্ষে বীরবলের কাছে অঙ্কের তত্ত্ব যে গুহায় নিহিত, তার প্রমাণ তার literatureয়ে taste আছে।

(২)

তারপর ভেবে দেখলুম যে, শ্রীমান দিলীপ ও চিঠি তাঁর গণিতশাস্ত্রে পারদর্শী বন্ধুদের না লিখে যে আমাকে লিখেছেন, তার কারণ শ্রীমানেরও literatureয়ে taste আছে। উপরন্তু তিনি এ বিষয়ে ওয়াকিবহাল যে, নানা বিষয়ে অনধিকারচর্চ্চা করবার বদ অভ্যাস আমার আছে। যথা, আমি সঙ্গীতশাস্ত্রে অব্যবসায়ী হয়েও সঙ্গীতের বিষয়ে উচ্চবাচ্য করি; ঋজুপাঠ প্রথম ভাগের বিদ্যে নিয়ে হর্ষচরিতের আলোচনা করি। এর কারণ, আমি শাস্ত্রী নই, সাহিত্যিক মাত্র। আর এই সব অনধিকার-চর্চ্চার দরুণ, শাস্ত্রীমহাশয়রা আমার প্রতি হয় চোখ রাঙান, নয় ঠোঁট বাঁকান। তাঁরা ভুলে যান যে, আমি তাঁদের এলাকায় ট্রেস্‌পাস্ করিনে। এ সত্য কি স্পষ্ট নয় যে, যেখানে শাস্ত্রের আরম্ভ সেইখানেই সাহিত্যের শেষ; অথবা যেখানে সাহিত্যের আরম্ভ সেইখানেই শাস্ত্রের শেষ? তা ছাড়া, যে কাজ একবার করা যায়, তা আর একবার করতে বাধে না। শ্রীমান দিলীপের চিঠি পাবার পূর্ব্বে, আমি ভারত-রোমক সমিতিতে "ফ্রান্সের নব মনোভাব" সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ পাঠ করি, এবং সে প্রবন্ধ বিচিত্রা-পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। উক্ত প্রবন্ধে আমি এই বিষয় নিয়েই নাড়াচাড়া করি। আর আমার বিশ্বাস, শ্রীমান দিলীপ যে-সকল বৈজ্ঞানিক আচার্য্যের বচন তাঁর পত্রে উদ্ধৃত করেছেন, আমি তাদের সকলেরই নাম উক্ত প্রবন্ধে উল্লেখ করি; যেহেতু তাঁদের নামজাদা পুস্তকাবলীর সঙ্গে আমার পরিচয় ছিল। বই আমি হাতে পেলেই পড়ি, সে বই বুঝি আর না বুঝি। যেমন কলম হাতে পড়লেই লেখবার প্রবৃত্তি কারও কারও পক্ষে অদম্য হয়ে ওঠে, আমিও তেমনি বই হাতে পড়লে তা পড়বার প্রবৃত্তি দমন করতে পারিনে। ইংরাজরা বলে

"যত খাও তত ক্ষিদে বাড়ে"। পড়বার ক্ষিদে আমার উক্ত কারণে বেড়ে গিয়েছে। সে যাই হোক্, পূর্ব্বোক্ত প্রবন্ধে আমি ইউরোপের যে নব মনোভাবের প্রতি বাঙালী পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি, শ্রীমান দিলীপও তাঁর পত্রে সেই একই মনোভাবের ব্যাখ্যান করেন। সুতরাং শ্রীমান দিলীপের পত্রপাঠমাত্র আমি উত্তরা-পত্রিকার মারফৎ তার প্রাপ্তিস্বীকার করি। আমার আশা ছিল যে, এই সুযোগে আর পাঁচজন বিশেষজ্ঞ এ আলোচনায় যোগ দেবেন। বিলেতের ছাড়া কাপড় পরে' মনোরাজ্যে বুক ফুলিয়ে বেড়ানোটা আমাদের পক্ষে শোভা পায় না। আর সে ভূভাগে ঊনবিংশ শতাব্দীর অনেক মনোভাব যে গতকল্যের মনোভাব বলে গণ্য হচ্ছে, সে কথাটা আমাদের শিক্ষিত সমাজকে শোনানো মন্দ নয়, এই ধারণাবশতঃই আমি উক্ত পরিবর্ত্তনের পরিচয় দিতে সাহসী হই।

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত আমার অনুরোধে এ আলোচনায় যোগ দেন। এ বিষয়ে তাঁর বক্তব্য তিনি বিচিত্রাপত্রিকায় প্রকাশ করেছেন। এবং তারই জবাবে, শ্রীমান দিলীপের খোলা চিঠি ভারতবর্ষে আবির্ভূত হয়েছে।

এ আলোচনার জন্মকথা ও ইতিহাস বিবৃত করলুম। এখন এ আলোচনার যথার্থ বিষয়টি কি, তা পরিষ্কার ও পরিচ্ছিন্ন করবার উদ্দেশ্যে আমার কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। এবং এ পত্রে আমি এ আলোচনার খেই ধরিয়ে দেবার চেষ্টা করব। এ পত্র এ আলোচনার উপসংহার স্বরূপে গণ্য করতে পারেন, না হয়ত উপক্রমণিকা হিসাবে।

(৩)

শ্রীমান দিলীপ অতুলবাবুকে সম্বোধন করে লিখেছেন যে—

"আপনার আর একটা যুক্তির সারবত্তা বা পয়েন্ট আমি কিছুতেই ধরতে পাচ্ছিনে। আপনি বলেছেন স্বাধিকার প্রমত্ত হয়ে পরের এলাকায় যে ট্রেস্‌পাস্ করেছেন, সে বিজ্ঞান নয়—বিজ্ঞানমুগ্ধ দর্শন।"

আমারও বিশ্বাস পরের এলাকায় অর্থাৎ ধর্ম্মক্ষেত্রে যে অনধিকারপ্রবেশ করে কুরুক্ষেত্র বাধিয়েছে, সে science নয় ; scientific philosophy। তা যদি না হত ত আমরা এ আলোচনায় কোন্ সাহসে যোগ দিলুম ?—এ জ্ঞান আমাদের আছে যে, আমাদের পুরোনো physicsএর জ্ঞানও যদ্রূপ, নব physicsএর জ্ঞানও তদ্রূপ। গাছ থেকে যে মাটিতে আপেল পড়ে, আর তার নাম যে gravitation, এই জ্ঞানই আমার বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সীমা। অপরপক্ষে philosophy নিয়ে বকাবকি করবার অধিকার আমাদের সকলেরই আছে। কারণ মানুষমাত্রেরই অন্তরে একটা না-একটা ফিলজফি থাকে, সে ফিলজফি যতই কাঁচা, যতই অস্পষ্ট হোক না কেন। সম্ভবতঃ এই অস্পষ্টতাই হচ্ছে ফিলজফির বিশেষত্ব। কারণ ফিলজফি চিরকালই জিজ্ঞাসা, কস্মিনকালেও মীমাংসা নয়। তাই এক যুগের মীমাংসা আর এক যুগের জিজ্ঞাসা হয়ে ওঠে।

নানাপ্রকার খণ্ডজ্ঞান নিয়ে মানুষের মন সুখী হয় না, তদুপরি বিশ্বের একটি অখণ্ড জ্ঞানলাভের প্রবৃত্তি মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক। এবং এই প্রবৃত্তি থেকেই ফিলজফির জন্ম। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন যে, ভক্তিযোগে স্ত্রী-শূদ্র প্রভৃতিরও সমান অধিকার আছে; তেমনি এই ফিলজফি নামক বিদ্যায় অ-দার্শনিকদেরও অধিকার আছে। এই বিশ্বাসে আমি এ আলোচনার আসরে নামতে সাহসী হয়েছি।

(৪)

বৈজ্ঞানিক-দর্শন বলেও যে একরকমের দর্শন আছে, এবং সে দর্শন যে বহুলোকের অন্তরঙ্গ হয়েছে, আমাদের এ অনুমান যে সত্য, তা রাসেল মহোদয়ের কথাতেই বুঝিয়ে দিচ্ছি; কারণ শ্রীমান দিলীপের মতে উক্ত লেখকের কথাগুলি অত্যন্ত "সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ।" রাসেলের কথাগুলি এই :—

On the one hand, we all depend upon scientific inventions and discoveries for our daily bread, and for our comforts and amusements.

On the other hand, certain habits of mind connected with a scientific outlook, have spread gradually during the past three centuries, from a few men of genius to large sections of the population.

Sceptical Essays.

এই অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত ও সারগর্ভ কথাগুলিকে আমি আরও সংক্ষিপ্ত করছি, আশা করি তাতে তাদের গর্ভস্থ সার নষ্ট হবে না। রাসেলের বাক্যের সংক্ষিপ্ত সার এই যে, বিজ্ঞানের দ্বে ফলে অমৃতোপমে একটি হচ্ছে "যন্ত্র", অপরটি "মন্ত্র"। আর বিজ্ঞানের এই মন্ত্রভাগের নামই scientific philosophy। এবং বিজ্ঞান সম্বন্ধে অজ্ঞ হয়েও এ দর্শনের মোহে অজ্ঞান হওয়া যায়, যেমন এ যুগে "large sections of the population" হয়েছে,—শুধু বিলেতে নয়, এ দেশেও।

(৫)

Whitehead, Eddington প্রভৃতি এ যুগের শীর্ষস্থানীয় বৈজ্ঞানিক ও অঙ্কজ্ঞানীরা তাঁদের নব মত প্রচার করে যে রাসেল সাহেবের daily bread, comforts and amusements কেড়ে নেবেন, এ ভয় তিনি পান না; কারণ তিনি Eddingtonএর Nature of the Physical World নামক প্রসিদ্ধ গ্রন্থ সম্বন্ধে এই মন্তব্য প্রকাশ করেছেন যে—যাক্ Science machineত থাক্‌বে—সোভানাল্লা! এ অবশ্য ঠাট্টা। কারণ যন্ত্র গড়া যে Science-এর অবরকর্ম্ম, এ জ্ঞান রাসেল সাহেবের পুরোমাত্রায় আছে। Scienceএর অপর ফল, "certain habits of mind

connected with a scientific outlook"—সাদা কথায় scientific philosophyর প্রতি বিজ্ঞানাচার্য্যেরা যে বিমুখ হয়েছেন, এতেই রাসেল সাহেব যুগপৎ ক্ষুব্ধ ও ক্রুদ্ধ হয়েছেন। এ ক্ষেত্রে তাঁর উক্ত বিজ্ঞানাচার্য্যদের প্রতি উপহাস স্পষ্টহাসি বটে, কিন্তু কষ্টহাসি।

এই Scientific philosophy জিনিষটে কি? এই বিরাট ও বিচিত্র বিশ্ব—মায় আমাদের মন ও প্রাণ—যে matter ও motion এর যোগবিয়োগের ফলে উৎপন্ন হয়েছে, এই সত্য হচ্ছে এ দর্শনের প্রথম সূত্র। আর পরমাণুর যোগাযোগ যে ঘটে, motionএর হালচালের ফলে, এবং তার পদ্ধতি যে mechanical, তা physics হাতে-কলমে দেখিয়ে দিয়েছে। এক কথায়, এই বিজ্ঞানমুগ্ধ দর্শনের নাম হচ্ছে Modern materialism। আর এ দর্শন যে যুগের লোকায়ত দর্শন হয়েছে ("large sections of population" এর গ্রাহ্য) তার কারণ এ দর্শন হৃদয়ঙ্গম করা অতি সহজ; কেননা তা common sense অর্থাৎ লৌকিক ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। Matter ও motion আমাদের সকলের কাছেই সুপরিচিত। আর যন্ত্রের ধর্ম্মের না হোক্ কর্ম্মের আমরা সকলেই পক্ষপাতী। কারণ যন্ত্রশক্তির প্রভাবেই মানুষে রূপকথার রাজ্যকে বাস্তব করে তুলেছে। আর এই যন্ত্রের যাদুই বহু লোককে science এর মন্ত্র মুগ্ধ করেছে।

(৬)

এখন এ কথা সকলেই জানেন যে, বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর। কিন্তু এ বিশ্বাসের জবাবদিহি করতে হলেই তর্ক করতে হয়। কাজেই philosophy মাত্রেই হয় religionএর অনুকূল, নয় প্রতিকূল। এখন materialism নামক philosophy যে religionএর পরিপন্থী—সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। অতীতেও materialism religious মনোভাবের সহায় ছিল না, বর্ত্তমানেও হতে পারে না। কি শৈব ধর্ম্ম, কি বৈষ্ণব ধর্ম্ম,

কোনটাই চার্ব্বাক দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় নি, হয়েছে বেদান্ত দর্শনের উপর; অন্ততঃ বেদান্ত দর্শন ও সব ধর্ম্মের পৃষ্ঠপোষক। চার্ব্বাক দর্শন হচ্ছে সেকেলে materialism, এবং বেদান্ত দর্শন হচ্ছে চিরকেলে idealism। Materialism এর মতে সৃষ্টির মূল ধাতু হচ্ছে matter, আর idealism এর মতে spirit।

এখন এ কথা অবিসম্বাদী যে, মানুষের প্রকৃতি অনুসারে এ দুয়ের মধ্যে একটি-না-একটি তার মনঃপূত হয়। দর্শন বিষয়েও লোকের রুচি ভিন্ন। সে রুচির ধাত লজিক বদলাতে পারে না, কারণ এই উভয় দর্শনই লজিকের ছুরিতে অকাট্য। বহুকাল পূর্ব্বে সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহকার মাধবাচার্য্য বলে গিয়েছেন—"দুরুচ্ছেদং হি চার্ব্বাকস্য চেষ্টিতম্"। অপরপক্ষে আজ ইউরোপীয় দার্শনিকরা বলছেন যে, idealism নামক দর্শন is logically irrefutable। এ সত্ত্বেও কেউ বা spiritকে বলেন ধোঁয়া, কেউ বা আবার matterকে বলেন মায়া।

আচ্ছা, এখন আমি স্বীকার করছি যে এই idealismই আমার মন স্বচ্ছন্দে অঙ্গীকার করতে পারে। Spirit যদি ধোঁয়াও হয় ত, সে ধুম পান করে' আমার মন চাঙ্গা হয়ে ওঠে; অপরপক্ষে পরমাণুর ছাতু আমার মনের অন্নও নয়, পথ্যও নয়। মনের ও-খোরাক আমার ধাতে সয় না। অবশ্য ফিলজফির ক্ষেত্রেও একদল ছাতুখোর আছেন, যাঁদের William James বলেন tough-minded, অর্থাৎ খোট্টা। দুঃখের বিষয় আমি সে জাতির লোক নই।

এখন আমি যতদূর বুঝি, এ যুগের বৈজ্ঞানিকরা, পরমাণুকে চিরে-চিরে আবিষ্কার করেছেন যে, তার অন্তরে matter নেই—আছে শুধু বিদ্যুৎগর্ভ মহাশূন্য। এর ফলে মানুষের মনের উপর materialismএর চাপ যে কমে যাবে, তা অবশ্য নয়; কিন্তু সে materialism আর scientific থাকবে না। Scienceএর জ্ঞান বিন্দুমাত্র না থেকেও যে

ঘোর materialist হওয়া যায়, তার প্রমাণ স্বয়ং চার্ব্বাক। প্রতিভাসম্পন্ন দার্শনিকরা কিছু না জেনেও সব জানেন।

(৭)

Idealism চিরকালই দর্শন হিসেবে religionএর আত্মীয়। আর যেহেতু এ যুগের বিজ্ঞান, materialismকে নিজের কোলে আর আশ্রয় দিচ্ছে না, তখন বৈজ্ঞানিকদের পক্ষে idealist হবার কোনও বাধা নেই। আর বাধা নেই বলেই অনেক বৈজ্ঞানিক Idealismকে প্রশ্রয় দিচ্ছেন, অন্ততঃ বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যে ধর্ম্মজ্ঞানের যম, এমন কথা আর জোর করে বলছেন না। ইদংএর জ্ঞান অহংজ্ঞানের অথবা আত্মজ্ঞানের স্থলাভিষিক্ত হতে পারে কি না, এ সন্দেহ সেকালের দার্শনিকদেরও ছিল। শঙ্কর এই কারণেই, প্রধানবাদ ওরফে সাংখ্য দর্শনের উপর লজিকের তলওয়ার চালিয়েছিলেন।

এখন Science বলতে আমরা একমাত্র Physics বুঝিনে; Biologyও science, এবং Psychologyও science। গত শতাব্দীতে পণ্ডিতদের ধারণা ছিল যে, মন ও প্রাণকে যতদিন Physicsএ পরিণত না করা যাবে, ততদিন Psychology ও Biology যথার্থ science হবে না। কারণ matter এবং motionএর বহির্ভূত অপর কোনও সত্তা কিম্বা শক্তি যে থাকৃতে পারে, সে ধারণা তাঁদের মনে স্থান পায়নি। কিন্তু বহু চেষ্টাতেও তাঁরা mindকে matterএ, এবং lifeকে motionএ মিলিয়ে দিতে পারেন নি। অর্থাৎ তাঁদের হাতে পড়ে ও দুই বস্তু পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়নি। Mind matterকে বাবা বলতে কিছুতেই রাজি হল না। মানুষের মাথার ব্রেন যে matter, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই; এবং mindএর সঙ্গে যে brainএর সম্বন্ধ আছে, সে বিষয়েও সন্দেহ নেই। অতএব mind হচ্ছে matterএর সূক্ষ্ম শরীর—এই ছিল গত শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক মত। Matterএর স্থূল শরীরই হোক আর সূক্ষ্ম শরীরই

হোক, উভয়েই যে matter, তা ত মোটা বুদ্ধির লোকরাও অস্বীকার করতে পারেন না ;—অতএব যার নাম matter তারই নাম mind, এ এ সত্যটা প্রমাণাভাবে অসিদ্ধ রয়ে গেল। Quantity সূক্ষ্ম হলেই যে তা Quality হয়—এই ছিল গত শতাব্দীর পণ্ডিতী ধারণা। এরকম কথা যে সম্পূর্ণ অর্থহীন, এ জ্ঞান এ যুগের psychologistদের হয়েছে। ফলে mindকে এখন আর কেউ in terms of matter বর্ণনা করেন না। Mind বলে যে একটি স্বতন্ত্র জিনিষ আছে, যার কোন explanation নেই, এই কথাটি মেনে নিয়ে তার description হচ্ছে নব Psychology। যা স্বতঃসিদ্ধ তার আবার প্রমাণ কি?

(৮)

তারপর biologistরাও আবিস্কার করলে যে life অর্থাৎ প্রাণকে Physicsএর গণ্ডীর ভিতর বন্দী করা যায় না। অর্থাৎ প্রাণের গুণাগুণ সব Physico-chemical lawএর সাহায্যে explain করা যায় না।

প্রাণীমাত্রেরই দেহ আছে, আর সে দেহটি matter ও motionএর যোগে গড়া। কিন্তু যাকে আমরা প্রাণ বলি, সে বস্তু যন্ত্র নয়—যন্ত্রী। এ যন্ত্রী, দেহ নামক যে বস্তু গড়ে, তা machine নয়—organism। সুতরাং modern materialismএর দ্বিতীয় সূত্র—mechanismএর, সাহায্যে প্রাণীর দেহের সৃষ্টির রহস্যও ব্যাখ্যা করা যায় না। প্রাণের কার্য্যের ভিতর purpose আছে, পরমাণুর উদ্দাম লীলার ভিতর নেই।

তারপর matterএর মূল ধাতু পরমাণুও এ যুগে physicsএর হাত ফস্কে গিয়েছে। এখন পরমাণু আর একটি ছোট্ট নিরেট গোলা নয়,—যা নিয়ে Physicistরা বিশ্ব-সৃষ্টির খেলা খেলতে পারেন। Atom হচ্ছে একাধিক electronএর একটি পরিবার মাত্র। আর এ সব ইলেক্ট্রনের পরস্পারের সম্পর্কও অতি দূর সম্পর্ক, আর এ পরিবারের মধ্যে আছে শুধু

ঘোর অশান্তি। এই বেয়াড়া পরিবার কখন ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে, তারও ঠিক নেই।

আগে যাকে ভাবতুম পরমাণু, তা এখন দেখছি হাঁ-ইলেকৃট্রিসিটির সঙ্গে না-ইলেকৃট্রিসিটির ভাব আর আড়ী ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন এই সব বিপরীত ধর্ম্মাবলম্বী ইলেকৃট্রাণুরা পদার্থ নয়; হয় তারা তেজকণা, নয় ত অশরীরী শক্তিবিন্দু—সম্ভবতঃ গণিতবিদের idea মাত্র। যদি তাই হয় ত বিশ্বের মূল ধাতু idea—বাহ্যবস্তু নয়; অর্থাৎ তা মনোগ্রাহ্য—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য নয়। এক কথায় Physics এখন অঙ্কের অন্তরে লীন হয়েছে। আর যা নিয়ে গণিতের কারবার, সে হচ্ছে আগাগোড়া idea,—কোন বস্তু নয়। যদি সত্যই তা হয়ে থাকে ত, এ যুগের বিশ্ব পদার্থ দিয়ে গড়া নয়, equation দিয়ে গড়া; অর্থাৎ science যে বিশ্ব গড়েছে, সে একরকম মানসী সৃষ্টি। অর্থাৎ matterএর পিছনে যা আছে তার নাম নাম mind। সংক্ষেপে ঊনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ছিল caterpillar, এ যুগের বিজ্ঞান হয়েছে butterfly। ভূচর যে খেচর হয়েছে, এ অবশ্য tragedy নয়। কারণ মাটি ছেড়ে আকাশে ওঠা ব্যাপারটা ঊর্দ্ধগতি,—অধোগতি নয়। এ অবস্থায় scienceএর সঙ্গে religionএর বিরোধ সম্ভবতঃ কমবে, কারণ religion ও গগন-বিহারী।

(৯)

অবশ্য এর থেকে কেউ যেন মনে না করেন যে, materialism নামক দর্শন লোকের মন থেকে একেবারে মুছে যাবে। মানুষমাত্রেরই দেহও আছে, মনও আছে। আর দেহ বস্তুটা যতটা ধরাছোঁয়া যায়, মন নামক পদার্থ ততটা নয়, কারণ মন আকাশের মতই উদার ও সীমাহীন। দেহ থেকে যে মনের জন্ম,—এ ভুল মানুষে যুগে যুগে করবেই। সুতরাং idealismএর পিঠপিঠি materialism ও চিরকালই দেখা দেবে। Modern materialism অপদস্থ হয়েছে অথবা হচ্ছে বলে যে

future materialism আবির্ভূত হবে না, এমন কথা কেউ বলতে পারেন না।

গত শতাব্দীতে physics metaphysics হয়ে উঠেছিল; এ যুগের বৈজ্ঞানিকরা আবিষ্কার করেছেন যে, পদার্থবিদ্যা পরাবিদ্যা নয়, অপরাবিদ্যা। এবং ও বিদ্যার চাবিতে বিশ্বের রহস্য উদ্ঘাটন করা যায় না। তা যে যায় না, তা Sir James Jeans-এর সদ্যোজাত পুস্তিকার নামেতেই প্রকাশ। এ পুস্তিকার নাম হচ্ছে The Mysterious Universe: যদিও Jeans এই বিরাট বিশ্ব ও তার অন্তর্গত ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র ইলেকট্রাণের সকল গূঢ় তত্ত্বই জানেন।

আমার শেষ কথা এই যে, এ আলোচনার একমাত্র উদ্দেশ্য আমাদের শিক্ষিত সমাজকে এই কথাটা শোনানো যে, materialism-এর আর যে গুণই থাক—তা scientific নয়। Science-এর প্রতি ভক্তি আমার অচলা, কারণ আমার বিশ্বাস science হচ্ছে মানববুদ্ধির অজর ও অমর কীর্ত্তি। তবে বিজ্ঞানভক্ত হলেই যে "ঈশাবাস্যমিদং সর্ব্বং যৎকিঞ্চ জগত্যাং জগৎ" এ জ্ঞান হারাতে হবে, তার কোন মানে নেই।

বীরবল।

নব-বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম।*

শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র গুপ্ত

শ্রীযুক্ত দিলীপকুমার রায়,

প্রীতিভাজনেষু।

(১)

অগ্রহায়ণের 'ভারতবর্ষে' আমাকে যে লম্বা খোলা চিঠি লিখেছেন (১) তা প'ড়লুম্। 'বিজ্ঞানের ট্র্যাজিডির' পর 'বিজ্ঞানের সুমতি' দেখে বোঝা গেল ট্র্যাজিডিটা বিজ্ঞান বেচারীর পক্ষে একবারে মারাত্মক হয় নি; বরং ফলে ওর সুমতি এসেছে। 'A great sorrow hath humanised its soul'।

আপনার 'বিজ্ঞানের ট্র্যাজিডি' উপলক্ষ্য ক'রে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান সম্বন্ধে 'বিচিত্রা' কাগজে আমি যা লিখেছি (২) তার ছাঁদটা আপনার কাছে বাঁকা মনে হয়েছে। কিছুই আশ্চর্য্য নয়। প্রাক্-বিংশ শতকের মদোদ্ধত বিজ্ঞানের ধর্ম্মদ্বেষ থেকে বিনয়-নম্র নব-বিজ্ঞানের ধর্ম্মপ্রাণতায় আপনি যে সোজা পথে পৌঁচেছেন আমার বিবেচনায় তা অতিরিক্ত রকম সরল;—সেই শ্রেণীর সরল পথ যা কখনও গন্তব্যে পৌঁছে না, তাকে tangentially কেটে যায়। আমার ধারণা ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের যোগাযোগ দেখ্‌তে একটু ঘোরা পথেই যেতে হয়। সেই পথের কিঞ্চিৎ আভাষ আমার 'ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধে দিতে চেষ্টা করেছি। সে পথ যদি

(১) বিজ্ঞানের সুমতি। 'ভারতবর্ষ' অগ্রহায়ণ, ১৩৩৭।

(২) ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান। 'বিচিত্রা' জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৭।

* নব-বিজ্ঞান ও ধর্ম্ম। 'বিচিত্রা' জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৮।

আপনার কাছে বক্রগতি মনে হয় তবে ক্ষুণ্ণ হবার আমার অধিকার নাই।

কথাটা একটু খুলে বলাই ভাল। আপনি ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সখ্য প্রমাণ করেছেন প্রধানতঃ নব-বিজ্ঞানের কয়েকজন বৈজ্ঞানিক ও বিজ্ঞানবিদ্ আচার্য্যদের বচন তুলে। আমার মতে এটা পণ্ডশ্রম। ও পথে এক বাক্যের ধূলো খাওয়া ছাড়া আর কিছু লাভের সম্ভাবনা নেই। কারণ, প্রথমতঃ বেশীর ভাগ বৈজ্ঞানিক ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ বিষয়ে কোনও কথাই বলেন না। তাঁরা নিজের নিজের বৈজ্ঞানিক ক্ষেত্রে একাগ্র থেকে কাজ ক'রে যান, বেশীর ভাগ লোক যেমন একনিষ্ঠ সাংসারিক জীবন যাপন করে। সুতরাং দু চার জন বৈজ্ঞানিকের বচন বৈজ্ঞানিকদের মত ব'লে এ ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া চলে না। তারপর যে অল্প কয়েকজন বৈজ্ঞানিক এ বিষয়ে কথা বলেন তাঁরা সবাই এক কথা বলেন না। এডিংটন যা বলেন, স্যর জেম্‌স্ জীন্‌স্ তা বলেন না; হোয়াইটহেড যা বলেন, বারট্রাণ্ড রাসেল তার বিপরীত বলেন। বৈজ্ঞানিকদের বাক্য দিয়ে ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের অবিরোধ প্রতিষ্ঠা হয় না, কেবল তাঁদের পরস্পরবিরুদ্ধ বচন দর্শনে বচনৈকপ্রমাণ লোকদের বুদ্ধিভেদ জন্মে। কিন্তু এ আপ্ত-প্রমাণের বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড় আপত্তি যে বৈজ্ঞানিকদের বাক্য এ ক্ষেত্রে আপ্ত-বাক্য নয়, কারণ এ বিষয়ে তাঁরা আপ্ত-পুরুষ, অর্থাৎ expert, নন্। বিজ্ঞানের যে বিশেষ কোঠায় যে বৈজ্ঞানিক কাজ করেন, সেইখানেই তাঁর বাক্য আপ্ত-বাক্য; অর্থাৎ যে পরীক্ষা ও যুক্তি দিয়ে সেখানে বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতিষ্ঠা হয় তা দেখার ও বোঝার যাদের ক্ষমতা বা সময় নেই তারা বৈজ্ঞানিকের কথার উপর বিশ্বাস ক'রে সে সত্য মেনে নিতে পারেন। কিন্তু তাঁদের নিজের কোটের বাইরে বৈজ্ঞানিকেরা যে সব বাক্য বলেন, বিজ্ঞান বিশেষের আচার্য্য ব'লে তার কোনও বিশেষ মূল্য নেই। সেখানে তাঁরা সাধারণ জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষ মাত্র, বিশেষজ্ঞ নন্। অনেক বৈজ্ঞানিক নিজের

বিশেষ বিজ্ঞানের বাইরে অনেক অদ্ভুত কথা বলেন, কারণ সে ক্ষেত্রে তাঁদের বুদ্ধির অনুশীলন হয় নি। হয় তো শিশুকালে উপদিষ্ট বা চারপাশের প্রচলিত অন্ধসংস্কার ছাড়া তাঁদের সে সব মতামতের আর কোনও ভিত্তি নেই। বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের সঙ্গে ধর্ম্ম-বিশ্বাসের সম্বন্ধ বিচার বিজ্ঞান বিশেষ নয়, এবং বৈজ্ঞানিকের বিশেষ ক্ষেত্র নয়। "একজন প্রসিদ্ধ ধর্ম্মপ্রবণ বৈজ্ঞানিকের একটি বই" সম্বন্ধে শ্রীঅরবিন্দের যে ধারাল সমালোচনাটি উদ্ধৃত ক'রেছেন তা স্মরণ করুন। "The part about the changed attitude of modern Science to its own field of discovery is interesting......The latter part of this book about religious experience I find very feeble ; it gives me the impression of a hen scratching the surface of the earth to find a scrap or two of food—nothing deeper."। কেন এমন হয়? বিজ্ঞানের ঈগল পক্ষী ধর্ম্মানুভূতির ক্ষেত্রে কেন পোষা মুরগী হ'য়ে পড়ে? কারণ আর কিছুই নয়,—এ ক্ষেত্রে ঐ প্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিকটির আমাদের মত পাঁচ জন অপ্রসিদ্ধ সাধারণ লোকের সঙ্গে কোনও তফাৎ নেই। তাঁর ধর্ম্মপ্রবণতা কোনও গভীর আধ্যাত্মিক অনুভূতির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়; জনসাধারণের ধর্ম্মবিশ্বাসের মত গতানুগতিক সংস্কারের ফল। ধর্ম্ম ও বিজ্ঞানের সম্বন্ধ বিচারে তিনি যে বুদ্ধির প্রয়োগ করেছেন তা মানুষের জ্ঞান ও অনুভূতির স্বরূপ-নির্ণয়কুশল দার্শনিক বুদ্ধি নয়, সাংসারিক ও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উপযোগী ব্যবহারিক ও বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিমাত্র।

আপনি কয়েকজন 'ধর্ম্মপ্রবণ' বৈজ্ঞানিকের বচন চয়ন করেছেন এই আশায় যে বৈজ্ঞানিকদের কথাতেই যখন আমাদের দেশের শিক্ষিত লোকের মনে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা মৃতকল্প হয়েছে, তখন তাঁদের কথাতেই তা আবার নব-জীবন পাবে। যে বিশ্বাস এমনি ধারা কথাতেই যায়

আবার কথাতেই হয় তা ম'রলেই বা দুঃখ কি, আর বাঁচলেই বা লাভ কতখানি? তার জন্য কেন বৃথা পরিশ্রম? দেশের শিক্ষিত সম্প্রদায়ের জ্ঞানবুদ্ধির উপর ওর চেয়ে একটু বেশী ভরসা রাখাই ভাল। বৈজ্ঞানিক-দের বচন শুনিয়ে আধ্যাত্মিকতায় বিশ্বাস জন্মানের 'সাইকলজিকাল' ফিকির হয় ত 'সেন্‌সেশানাল্', কিন্তু ওতে স্থায়ী ফলের কোনও সম্ভাবনা নাই। প্রকৃত ফললাভের পথ হচ্ছে যুক্তির পথ, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতায় স্বরূপ বিশ্লেষণ ও বিচার। নবীন বৈজ্ঞানিকদের বাক্য দিয়ে প্রাচীন বৈজ্ঞানিকদের বাক্যের মোহ থেকে মনকে মুক্ত করার চেষ্টা হচ্ছে আফিম্ ধরিয়ে মদ ছাড়ানের চেষ্টার মত। পশ্চিমী বুলির মোহান্ধতা দেশের মন থেকে দূর করার উপায় নয় আরও এক রকমের ঐ দেশী বুলি সেখানে জমা করা। তাতে শুধু এই ধারনাই বদ্ধমূল হয় যে কি অন্ধকার কি আলো সবই আনতে হবে সেখান থেকে, তা ছাড়া গত্যন্তর নেই। আপনি একে বলেছেন গঙ্গাজলে গঙ্গাপূজা। কথা ঠিক। একমাত্র গঙ্গাজলের পাবনত্বে যখন সংস্কার দৃঢ় হয় তখন গঙ্গাপূজাও গঙ্গাজলে না ক'রে উপায় থাকে না।

(২)

আপনি 'বিজ্ঞানের সুমতি' প্রবন্ধে লিখেছেন যে "আধুনিক চিন্তাশীল মানুষ (ও বৈজ্ঞানিকও) আবিষ্কার ক'রেছেন যে বিজ্ঞান প্রথমটায় স্বাধিকার-প্রমত্ত হ'য়ে এমন সব বিষয়ে অম্লানবদনে রায় দিতে সুরু ক'রেছিল, যে-সব বিষয়ে রায় দেওয়ার অধিকারী সে নয়।" আর এমনধারা জজিয়তীর দাবার "অসারতার দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করার এক্তিয়ার মানুষের চিরন্তন।" এবং একটু অনুযোগের সুরে ব'লেছেন, "আর 'বিজ্ঞানের ট্র্যাজিডি'-তে আমি এ ছাড়া কীই বা ক'রেছি বলুন?" কেবল যদি তাই হ'তো তবে বোধ হয় স্বীকার ক'রবেন যে প্রবন্ধের

'বিজ্ঞানের ট্র্যাজিডি' নামটা হ'য়েছিল একটু অতিরিক্ত রকম—যাকে বিজ্ঞাপনের ভাষায় বলে—'চমকপ্রদ'। কিন্তু সত্য কথা তা নয়। আপনার প্রবন্ধের মূল বক্তব্য ছিল যে বিজ্ঞান আজ একটা ট্র্যাজিক অবস্থায় উপনীত হ'য়েছে, আর প্রতিপাদ্য ছিল সেই ট্র্যাজিডির স্বরূপ। অবশ্য আপনি গুণীলোক, শুধু ঐকথাটাই সোজাসুজি ব'লে থামেন নি, অনেক মনোহারী কথা সঙ্গে সঙ্গে ব'লেছেন যারা হয় তো মূল বিষয়টাকে একটু ছাপিয়ে গেছে, গানের সুর যেমন তার কথাকে ছাপিয়ে যায়। অল্প কথায় 'বিজ্ঞানের ট্র্যাজিডিটা' হচ্ছে এই :—বিজ্ঞানের কাজ কর্ম্ম চলে প্রাকৃতিক শৃঙ্খলায়, অর্থাৎ সমস্ত প্রাকৃতিক ঘটনার মধ্যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধ রয়েছে এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর ক'রে। কিন্তু আজ বৈজ্ঞানিকেরা হঠাৎ আবিষ্কার ক'রেছেন যে এই বিশ্বাসকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় না, ওকে বিনা প্রমাণে মেনে নিতে হয়। সুতরাং বিজ্ঞানের যে মজবুত-দর্শন যুক্তির পাকা গাঁথনি তার ভিত্তি হচ্ছে একটা প্রমাণহীন অর্থাৎ অন্ধ বিশ্বাস মাত্র। এবং যদি তা-ই হয় তবে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতা যখন প্রমাণহীন বস্তুতে বিশ্বাসের দাবী করে তখন তার বিরুদ্ধে বিজ্ঞানের কিছু বলার অধিকার নেই। বিজ্ঞানের এই non-rational basis প্রকাশ হ'য়ে পড়াতে এ যুগে তার আত্মসর্ব্বস্বতা ক'মে এসেছে; এবং "য়ুরোপের (অনেক) চিন্তাশীল বৈজ্ঞানিক ও মনীষীরা......... অযৌক্তিক বিশ্বাস, ধর্ম্ম, অতীন্দ্রিয় অনুভূতি প্রভৃতিকে একটু শ্রদ্ধার চোখে দেখতে আরম্ভ করেছেন"।

স্পষ্ট ক'রেই বলছি এই 'ট্র্যাজিডির' প্রথম অঙ্ক থেকে শেষ পর্য্যন্ত সব-ই আমার কাছে অবোধ্য মনে হয়েছে। আমার মনে হয়েছে ওর ইতিহাস কাল্পনিক, ওর লজিক বে-পরোয়া, ওর 'সাইকলজি' মনগড়া। কারণ কি, সংক্ষেপে নিবেদন করছি। কার্য্যকারণ শৃঙ্খলায় বিশ্বাস, অর্থাৎ যে Causality inductionএর মূল, তা যে প্রমাণ করা যায় না,

বিনা প্রমাণে মেনে নেওয়া হয়, এটা এ যুগের কোনও বৈজ্ঞানিকের হঠাৎ আবিষ্কার নয়। আধুনিক বিজ্ঞানের জন্মলাভের বহু শতাব্দী বৎসর পূর্ব্ব থেকেই দার্শনিকেরা ও তর্ক তুলেছেন। কারণ induction শুধু বিজ্ঞানের মূলে নেই,যে জ্ঞানের উপর আমাদের দৈনিক জীবন-যাত্রা চল্‌ছে তারও ঐ মূল। ক্ষুধা পেলে আমরা খাই, কিন্তু খেলে যে ক্ষুধা যাবে এ বিশ্বাসের ভিত্তি কি? দার্শনিকেরা দেখিয়েছেন যে শেষ পর্য্যন্ত এ বিশ্বাসকে যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যায় না। এ তর্ক কত প্রাচীন তাই দেখাবার জন্য আমার 'ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধে চার্ব্বাকের অনুমান-প্রমাণ-খণ্ডনের কথা বলেছিলাম। সেটা আপনার কাছে এমন অসঙ্গত রকম অপ্রাসঙ্গিক মনে হয়েছে যে আপনার হাস্য-রসকে উদ্রিক্ত ক'রে 'পিকুইক পেপার্স'-এর স্থান বিশেষ স্মরণ করিয়ে দিয়েছে। কেন তা ঠিক বুঝতে পারি নি। কেমন সন্দেহ হচ্ছে যে চার্ব্বাক-উদয়নের নাম না ক'রে যদি কোনও গ্রীক স্কেপ্‌টিকের নাম করতুম তা হ'লে এ রকম অসঙ্গতিবোধ মনে জাগ্‌তো না। যা হোক প্রাচীন কথা ছেড়েই দি। বার্ট্রাণ্ড রাসেলের নজীরে অবশ্য স্বীকার করবেন যে Causality ও induction নিয়ে এই 'scandal' আরম্ভ হয়েছে "ever since the time of Hume"। কারণ রাসেলের 'Is Science Superstitious?' আমি পড়ি বা না পড়ি আপনি অবশ্য পড়েছেন। হিউম তাঁর 'মানবীয় জ্ঞানের তথ্যানুসন্ধান' নামে যে পুঁথিতে কার্য্যকারণ সম্বন্ধের এই বৈনাশিক বিচার করেন তা প্রকাশ হয় ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে। নিশ্চয়ই জানেন কাণ্ট নিজে বলেছেন যে সেই বিচার পড়েই তাঁর 'ডগ্‌মাটিক্' তন্দ্রা ছুটে যায় এবং জ্ঞানের স্বরূপ ও সম্ভাবনা অনুসন্ধানে তিনি ব্রতী হন। ফল The Critique of Pure Reason; যে গ্রন্থে কাণ্ট প্রমাণ করতে চেষ্টা করেছেন যে কার্য্যকারণ সম্বন্ধের সাধারণ বোধ মানুষ ভূয়োদর্শনের ফলে পায় না; ওর ছক মনের মধ্যেই আছে, ইন্দ্রিয়ানুভূতিকে মন সেই

ছকের মধ্যে গ্রহণ করে। এ গ্রন্থ প্রকাশ হয় ১৭৮১ খৃষ্টাব্দে। কাণ্টের মত ভুল কি শুদ্ধ তা নিয়ে কথা নয়। কিন্তু তাঁর আলোচনায় এটা অবশ্যই প্রমাণ হয় যে বৈজ্ঞানিক ও ব্যবহারিক জ্ঞানের মূল-ভিত্তি প্রাকৃতিক শৃঙ্খলায় বিশ্বাসের যুক্তি-প্রমাণ যে শিথিল এটা এ যুগের বৈজ্ঞানিকদের আবিষ্কার নয়। আর কি ক'রেই বা বিশ্বাস করা যায় যে বৈজ্ঞানিকেরা হিউমের পর দেড়-শ বছর ধ'রে ও তথ্য সম্বন্ধে হত-চেতন ছিলেন, আজ হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে তা চোখে দেখ্‌লেন। আপনি লিখেছেন, এ তথ্যে 'বিজ্ঞানের দার্শনিক ভিত্তির মধ্যে ভূমিকম্প হ'য়ে যায়'। অবশ্য হয়। কিন্তু মনে রাখ্‌বেন এ ভূমিকম্প নিতান্ত কমপক্ষে আরম্ভ হয়েছে ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দ থেকে। নিউটনের 'প্রিন্‌সিপিয়া' প্রকাশ হয় ১৬৮৫ থেকে ১৬৮৭ খৃষ্টাব্দের মধ্যে। অর্থাৎ আধুনিক বিজ্ঞানের ইমারতের বেশীর ভাগ গড়া হয়েছে ঐ ভূমিকম্পের মধ্যেই। কারণ অতি স্পষ্ট। ঐ বৈজ্ঞানিক—দর্শনের' উপর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের আবিষ্কার ও প্রসার কিছুমাত্র নির্ভর করে না। এ কথা আমার 'ধর্ম্ম ও বিজ্ঞান' প্রবন্ধে বল্‌তে চেষ্টা করেছি, পুনরুক্তি ক'রে লাভ নেই। প্রাকৃতিক শৃঙ্খলায় বিশ্বাস যে যুক্তিসিদ্ধ সত্য নয়, বিশ্বাস মাত্র—এই তথ্যের আবিষ্কারে বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান বিনয়ী হ'য়ে উঠেছে এ ইতিহাস মেনে নেওয়া কঠিন, কারণ সন তারিখের মিল হয় না।

এ 'ট্র্যাজিডির' যুক্তির দিকটাও মনে সমান খট্‌কা লাগায়। প্রাকৃতিক শৃঙ্খলায় বিশ্বাস যুক্তি-প্রতিষ্ঠিত সত্য নয়, faith মাত্র; সুতরাং religious faithও সমান গ্রাহ্য কেননা দুই-ই faith—এটা যুক্তি নয়, সুধু কথা নিয়ে খেলা। প্রাকৃতিক শৃঙ্খলায় যে faith তা মানুষের প্রতিদিনকার প্রতিকাজে verify হচ্ছে, এবং সেইজন্যই যুক্তি দিয়ে প্রমাণ করা যাক না যাক মানুষ তাতে আস্থাবান। Religious faith এ ধরণের faith নয়, এবং এই উপমান প্রমাণটিও সেইজন্য

লাগসই নয়। যদি হ'তো তবে ওলাদেবী ও মা শীতলায় faith-এর বিরুদ্ধেও কিছুই বলার থাকৃতো না। আপনি এডিংটনের বচন ভুলেছেন "I think we should not deny validity to certain inner convictions, which seem parallel with the unreasoning trust in reason which is at the basis of mathematics."। আমাদের কতকগুলি আধ্যাত্মিক অনুভূতির প্রামাণ্যে যে সংশয় করা চলে না এতে কোনও কথা নেই, কিন্তু তার কারণ এ নয় যে গণিত শাস্ত্র ও পদার্থ বিজ্ঞানের মূলে যে যুক্তি-নিরপেক্ষ বিশ্বাস রয়েছে ঐ আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলি তার সমধর্ম্মী। আধ্যাত্মিক অনুভূতিগুলির প্রমাণ্য হচ্ছে তার নিজেদের স্বরূপ যা সংশয়ের কোনও অবসর রাখে না, সমস্ত সংশয় ছেদন ক'রেই মনে উদয় হয়। ঐ inner conviction-গুলির validity রয়েছে convictionগুলির মধ্যেই, গণিত ও পদার্থ-বিজ্ঞানের মূলের 'unreasoning trust'-এর সঙ্গে parallelism-এর মধ্যে নয়। এ 'unreasoning trust' ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি মোটেই সমধর্ম্মী নয়। এর প্রথমটি হচ্ছে hypothesis ও postulate জাতীয় দ্বিতীয়টি illumination; যে reason এর উপর প্রথমটির বিশ্বাস তা হচ্ছে বুদ্ধির abstraction, আধ্যাত্মিক অনুভূতি হ'ল concrete realisation। এর প্রথমটির সঙ্গে সমধর্ম্মিত্ব দ্বিতীয়টি সম্বন্ধে মনকে নিঃসংশয় করে এ কথা এডিংটন বল্লেও মানা চলে না। 'বাধিতমর্থং বেদোঽপি ন বোধয়তি'।

তারপর আপনি কি সত্যই বিশ্বাস করেন যে বিজ্ঞানের non-rational ভিত্তির অনুভূতিই এডিংটন প্রভৃতির ধর্ম্ম-প্রাণতা ও আধ্যাত্মিকতার কারণ? সত্য কথা কি এই নয় যে মনের একদিকের প্রেরণায় তাঁরা হয়েছেন বৈজ্ঞানিক, অন্যদিকের প্রেরণা তাঁদের ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতায় শ্রদ্ধাশীল করেছে। এবং যেহেতু তাঁরা প্রথমে বৈজ্ঞানিক ও পরে আধ্যাত্মিক সেইজন্য তাঁদের মধ্যে কেউ কেউ 'এপলজিয়া

রচনা করে দেখিয়েছেন যে বৈজ্ঞানিকতা ও আধ্যাত্মিকতার মধ্যে কোনও বিরোধ নেই। এবং কখনও কখনও একটু মাত্রা ছাড়িয়ে বিংশ-শতাব্দীর নব-বিজ্ঞানের মধ্যেই আধ্যাত্মিকতার সমর্থন খুঁজেছেন। তাঁদের এই শেষ শ্রেণীর চেষ্টাগুলিকে বেশী চেপে ধরা কিছু নয়। কারণ একটু চাপাচাপি করলে এ চেষ্টার মূলে এই মনোভাব বেরিয়ে পড়ে যে জড় সূক্ষ্ম ও জটিল হ'লেই চৈতন্যের কাছাকাছি আসে। 'এটমের' মার্বেল যদিও জড় পদার্থ ছিল, ইলেকট্রনের 'ওয়েভ মিকানিক্স' চিৎবস্তুরই সামিল! স্যামুয়েল জন্‌সন্‌ যে পাথরটিতে বুটের লাথি মেরে বিশপ বার্কলির সর্ব্ব-বিজ্ঞানবাদ অপ্রমাণ করতে চেয়েছিলেন, সে পাথর বিদ্যুৎ-কণার সমষ্টি প্রমাণ হওয়ায় জন্‌সনের চেষ্টার হাস্যকরত্ব আরও বেশী সপ্রমাণ হয়েছে—এ সব কথা অতি বড় বৈজ্ঞানিকে বল্লেও কথাগুলি ছেলেমানুষিই থেকে যায়।

(৩)

আপনি বিজ্ঞান ও ধর্ম্মের যোগাযোগ সম্বন্ধে আপনার ও আমার মতের মিল-গরমিলের কথা তুলেছেন, এবং বলেছেন যে তর্কের ধূলো সরিয়ে দেখ্‌লে দেখা যাবে যে আমাদের মধ্যে বিরোধের চেয়ে মিলই বেশী। এ কথা অবশ্য সত্য। বৈজ্ঞানিক জ্ঞান যে জগতের একটা বিশেষ রকম ঐকদেশিক জ্ঞান, এবং আধ্যাত্মিক অনুভূতির ভালমন্দ কোনও সমালোচনা তার এলাকার বাইরে—এ আমাদের উভয়েরই বক্তব্য। কিন্তু আপনি যখন নব-বিজ্ঞানের দু-এক জন আচার্য্যের অনু-সরণ ক'রে বিংশ শতাব্দীর আবিষ্কৃত বৈজ্ঞানিক তথ্যের মধ্যেই আধ্যা-ত্মিকতার অনুকূল যুক্তি খুঁজে বের করেন, তখনি আমার আপত্তি আরম্ভ হয়। কারণ আমার মতে এ চেষ্টা সুধু নিরর্থক নয়, মিথ্যা-জ্ঞানের বীজ। উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞান ও বিংশশতাব্দীর বিজ্ঞানের মধ্যে কোনও জাতিভেদ নেই, এবং সকল শতাব্দীর বিজ্ঞানই হবে ঐ এক জাতীয়;

অর্থাৎ মানুষের জাগতিক অনুভূতির এক বিশেষ রকমের ঐকদেশিক জ্ঞান। সেইজন্য সকল শতাব্দীর বিজ্ঞান ও সকল রকম বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সঙ্গে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার একই সম্বন্ধ—ঔদাসীন্য বা 'নিউট্রালিটি' শত্রুভাব কি মিত্রভাব নয়। কোনও বিশেষ যুগের বিশেষ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব বা চিন্তাধারাকে আধ্যাত্মিকতার অনুকূল ব'লে গ্রহণ ও প্রচারের লোভটা সম্বরণ করতে হবে। কারণ ওটা মায়া। আর এ কথাও ত খুব স্পষ্ট যে মিত্র যে হ'তে পারে তার শত্রু হবারও সামর্থ্য ও সম্ভাবনা রয়েছে। আপনি মুখে বলেছেন বটে যে আমাদের আধ্যাত্মিক অনুভূতির গ্রাহ্যত্ব বিজ্ঞান দিয়ে প্রমাণও হ'তে পারে না, অপ্রমাণও হ'তে পারে না। কিন্তু আমার মনে হয়েছে ঐ প্রতিজ্ঞার প্রথম অংশটা সম্পূর্ণ নির্ম্মম হ'য়ে আপনি সর্ব্বত্র প্রয়োগ করতে পারেন নি। মনের কোণে কেমন একটু মমতা রয়েছে যে নব-বিজ্ঞানের বাণী থেকে আধ্যাত্মিকতার সপক্ষে যদি দু একটা যুক্তি পাওয়া যায় তবে মন্দই বা কি; যদিও ও প্রতিজ্ঞাটির প্রথম ও শেষ অংশ একই সুতোয় বাঁধা; ওর একটিকে ছেড়ে অন্যটিকে নেবার যো নেই। জানি আপনার এ চেষ্টার সমর্থনে খুব বড় বড় বৈজ্ঞানিকের দুটো একটা নজীর আছে। কিন্তু তাতে শুধু এই সন্দেহই দৃঢ় হয় যে যেমন উনবিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানকে আশ্রয় ক'রে একটা বৈজ্ঞানিক-দর্শন গ'ড়ে উঠেছিল, যা বহুলোকের বুদ্ধিকে উদ্‌ভ্রান্ত ক'রেছিল, এবং আজও করছে; তেমনি বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানকে আশ্রয় ক'রে আর একটা বৈজ্ঞানিক-দর্শন তৈরী হচ্ছে যা মানুষের বুদ্ধিকে অন্য পথে হ'লেও সমানই বিপথগামী করবে। এবং ও বিজ্ঞানের পরমায়ু যখন শেষ হবে তখনও তার ভূত মানুষের বদ্ধির কাঁধে চেপে দৌরাত্ম্য করতে থাকবে।

বিজ্ঞান ও এই বৈজ্ঞানিক-দর্শনের মধ্যে আমি যে ভেদ-রেখা টেনেছি সেটা আপনার কাছে নব্য-ন্যায়ের চুলচেরা ছাড়া আর কিছু মনে হয় নি

কিন্তু বিষয়টি আপনি আলোচনা করেন নি, শুধু আলোচনার মোড় ফিরিয়ে তাকে এমন পথে নিয়েছেন যেটা একটা 'কাল ডি সাক্'। আপনি প্রশ্ন তুলেছেন এই বৈজ্ঞানিক-দর্শনের উৎপত্তি ও বৃদ্ধির জন্য বিজ্ঞান দায়ী কিনা। এখানে বিজ্ঞান অর্থে বৈজ্ঞানিক। অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকেরা উৎসাহ ও প্রশ্রয় দিয়ে বৈজ্ঞানিক-দর্শনের সৃষ্টি ও প্রসারে সাহায্য করেছেন কিনা। উত্তর—কেউ কেউ করেছেন, কেউ কেউ উল্টো করেছেন, কারণ তাঁরা গোড়া খৃষ্টান ছিলেন, বেশীর ভাগ ও নিয়ে কখনও মাথা ঘামান নি, নিজের কাজ ক'রে গেছেন। মেনে নিলুম্ 'নেগ্‌লিজেন্স' দোষে এ শেষের দলও দায়ী, "অব্রুবন্ বিব্রুবন্ বাহপি নরো ভবতি কিল্মিষী"। কিন্তু এ তর্কের ফল কি? এতে কি বিষয়ের আলোচনা এক পা-ও এগিয়ে যায়? প্রকৃত আলোচনার বিষয় হচ্ছে ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলির মধ্যে এমন কিছু ছিল কিনা যার 'লজিকাল' ফল হচ্ছে এই বৈজ্ঞানিক-দর্শন। যদি না থেকে থাকে তবে ও দর্শনের জন্য বিজ্ঞান দায়ী নয়। ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতার বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক-দর্শন যে-সব তর্ক তুলেছে তার যে কোনও প্রকৃত সমর্থন বিজ্ঞানের মধ্যে নেই এই-টিই হচ্ছে জ্ঞাতব্য ও অনুধাবনার বিষয়। কোন্ বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের প্রকৃত স্বরূপ না বুঝে বিজ্ঞানের নামে ধর্ম্ম ও আধ্যাত্মিকতাকে মূর্খের মত আক্রমণ করেছে—এটা অতি তুচ্ছ ঝগড়া। এই অন্যায় আক্রমণের জন্য আপনি অনেকখানি moral anger 'আধ্যাত্মিক উষ্মা' প্রকাশ করেছেন। এবং খৃষ্টানদের অসহিষ্ণুতার জন্য বারট্রাণ্ড রাসেল যে-যীশুকে দায়ী করেছেন, দেশপ্রেমের অনাচার দেখে রোমাঁ রোলাঁ প্রভৃতি যে 'শেষটায় দেশপ্রেম-পরিপন্থী হ'তে বাধ্য হয়েছেন'—এ সব নজীরও দেখিয়েছেন। আপনাদের হৃদয়ের সুপেলব মহত্ত্বের কাছে মাথা নোয়াচ্ছি। শুধু বুঝ্‌তে পারছি না এ সব সহৃদয়তার আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে প্রমাণ হচ্ছে কি? ধর্ম্ম ও

ও আধ্যাত্মিকতার নামে পৃথিবীতে অনেক নিষ্ঠুরতা ও ভণ্ডামী এসেছে—তার জন্য ওদের বিদায় দিতে হবে, না বিজ্ঞানের নামে অনেক অজ্ঞান প্রচার হ'য়েছে ব'লে বিজ্ঞানকে অগ্রাহ্য করতে হবে? মানুষের অদৃষ্টই এমনি যে সে যদি একটা সত্য পায়, তখনি তিনটা মিথ্যা তার আশ্রয়ে গজিয়ে উঠে তাকে আঁকড়ে ধ'রে। এ জন্য সত্যের উপর চোখ রাঙিয়ে লাভ নেই। বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে এই মিথ্যা থেকে সত্যকে তফাৎ ক'রে জানা ও জানানো।

(৪)

বৈজ্ঞানিক-দর্শন ও বিজ্ঞান যে এক বস্তু নয়, ওরা যে "তমঃপ্রকাশবৎ বিরুদ্ধস্বভাব," এই বিবেকজ্ঞান না হ'লে গোলযোগ ঘটে পদে পদে। তখন এর একের ধর্ম্ম অন্যে আরোপ ক'রে নানা মায়া ও মিথ্যাজ্ঞানে মানুষের বুদ্ধি নিজেকে জড়িয়ে ফেলে। বারট্রাণ্ড রাসেলের 'Is Science Superstitious ?' সন্দর্ভটি এর একটা উদাহরণ। বিজ্ঞানের ব্রহ্মাবর্ত্ত পশ্চিম ইউরোপে বিজ্ঞানের পুরোহিত-মণ্ডলীতে যে বিশ্বাস ও ভক্তির খর্ব্বতা লক্ষ্য ক'রে রাসেল বিজ্ঞানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে শঙ্কিত হ'য়েছেন তা মোটেই বিজ্ঞানের উপর ভক্তি বিশ্বাস নয়, এই বৈজ্ঞানিক-দর্শনের উপর আস্থা ও অনুরক্তি। রাসেল যাকে বলেন 'Scientific out-look' তা science-এর 'আউট্‌লুক্' নয়, উনবিংশ শতাব্দীর এই scientific philosophyর 'আউট্‌লুক্'। অর্থাৎ বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে একটা ফাটা ছাঁটা ধারণা ও সংস্কার। রাসেল ধ'রে নিয়েছেন যে গত তিন শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সৃষ্টির মূলে রয়েছে এই ধারণা ও সংস্কার। এটা একটা প্রকাণ্ড মায়া। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যাঁরা প্রকৃত স্রষ্টা, শুধু গুণজ্ঞ নন্, রাসেলের ভাষায় যাঁরা creator কেবল appreciator নন্, তাঁরা যে জগৎ-ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে কোনও একটা বিশেষ ধারণা নিয়ে বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে ব্রতী হ'য়েছিলেন তার কোনও প্রমাণ নেই। বরং উল্টো দেখা

যায় যে বিজ্ঞানের প্রধান স্রষ্টাদের অনেকের মনে নানা অন্ধ-সংস্কার ছিল, যে সব সংস্কার তাদের বিশেষ বিভাগের বৈজ্ঞানিক কাজের কোনও বাধা হয় নি। কেপ্‌লার বিশ্বাস করতেন যে প্রতি গ্রহের এক এক জন অধিষ্ঠাতা দেবতা আছেন, যিনি কেপ্‌লারের আবিষ্কৃত নির্দ্দিষ্ট পথে গ্রহটিকে ঘুরিয়ে বেড়াচ্ছেন। নিউটন জগৎ-সৃষ্টির, বিশেষ ক'রে জীব-সৃষ্টির কৌশল দেখে একজন চেতন ও বুদ্ধিমান জগৎ-স্রষ্টায় বিশ্বাসী ছিলেন, রাসেল নিশ্চয় যাকে 'এনৃথ্রপমর্‌ফিক্‌' কুসংস্কার বল্‌বেন। সত্য কথা এই যে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে একটা অখণ্ড দৃষ্টি বা 'আউট্‌লুকে' বৈজ্ঞানিকের কোনও প্রয়োজন নেই। এ রকম দৃষ্টি, যা বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে একটা তত্ত্ববিশেষে এমন আবদ্ধ যে তার পরিপন্থী কোনও কিছুকে স্বীকার করতে নারাজ, তা বৈজ্ঞানিকের কাজের সহায় নয়, বাধা। জগৎ সম্বন্ধে এরকম 'আউটলুকের' সৃষ্টি; যার কোথাও কোনও গরমিল থাকবে না—এ হচ্ছে দর্শন-শাস্ত্রের চেষ্টা। এবং এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা বরাবর নিউটনের সতর্কতার বাণী মেনে আসছেন, "Beware of metaphysics"। যে বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানের যে বিশেষ বিভাগে কাজ করেন তাঁর কাজের উপযোগী 'আউট্‌লুক্‌' তাঁর প্রতিভা তাঁকে এনে দেয়। সে 'আউট্‌লুক্‌' মানুষের সমস্ত অনুভূতির সঙ্গে খাপ খায় কিনা, এমন কি বিজ্ঞানের অন্যান্য বিভাগে লাগ-সই কিনা সে চিন্তা তাঁর নেই। 'Scientific cutlook' কথাটাই একটা abstraction। সব বিজ্ঞানের এক 'আউট্‌লুক্‌' নয়। আধুনিক mathematical physics-এর যে 'আউট্‌লুক্‌', আধুনিক biologyর কাজ সে 'আউট্‌লুক্‌' নিয়ে চলে না। বরং physics-এর 'আউট্‌লুক্‌' নিয়ে কাজ করতে গিয়ে তার উন্নতি বহুদিন বন্ধ ছিল। সে 'আউট্‌লুক্‌' ছেড়ে বিষয়ের উপযোগী অন্য 'আউট্‌লুক্‌' নিয়ে কাজ আরম্ভ করায় বিংশ শতাব্দীর biology অপূর্ব্ব সাফল্য লাভ করেছে।

বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে প্রকৃত স্রষ্টা, বারট্রাণ্ড রাসেলের মত কেবল রসয়িতা নন্, এমন একজন লোকের সাক্ষ্য নেওয়া যাক্। আমেরিকান বৈজ্ঞানিক রবার্ট মিলিকান বিংশ শতাব্দীর নব-বিজ্ঞানের একজন প্রধান কর্ম্মী। ইলেকট্রণ সম্বন্ধে তাঁর খাঁপযোকের কাজ সুপরিচিত, যার জন্য ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ফিজিক্সের নোবেল পুরস্কার তাঁকে দেওয়া হয়। বর্ত্তমানে 'কস্‌মিক্ র‍্যাডিয়েশন্' সম্বন্ধে তাঁর আবিষ্কার বিজ্ঞান-জগতের বিস্ময়। তাঁর Science and the New Civilization গ্রন্থের একটি প্রবন্ধে মিলিকান লিখ্‌ছেন,—"I am not worrying here over the recent introduction of the so-called 'principle of un-certainty' in microscopic processes, an event that is causing so much excitement among physicists just now. This may indeed be consoling or, at least, illuminating to those non-physicists who have been worrying their heads over their inability to reconcile the principle of law with the facts of free-will and responsibility. We physicists have had much worse contradictions than these to put up with in the subject of physics alone, as for example, the recon-ciliation of the wave theory of light with the essentially corpuscular light-quant theory. Experiment has told us that both theories are right, and we have had the limita-tions of our knowledge jolted into us enough times lately in physics to believe it in spite of our inability to see as yet just now how the reconciliation is to be made. * * * But I do'nt think this particular prblem ever worried the physicist, for he has always known that his ignorance was

as yet quite ample enough to cover the links in the reconciliation that must exist. Eighteenth-and-nineteenth century materialism never had any lure for him, for it always represented quite as pure dogmatism—assertiveness without knowledge—as did mediäeval theology." (১)। বলা বাহুল্য বারট্রাণ্ড রাসেল যাকে বলেন 'scientific outlook,' তাই হচ্ছে মিলিকানের "Eighteenth—and—nineteenth century materialism"। রাসেলের মতে বৈজ্ঞানিক-মনে, এর প্রেরণাই বিজ্ঞানকে ক্রমাগত অগ্রসর ক'রে এনেছে, মিলিকান বলেন বৈজ্ঞানিকদের মনে এর কোনও আকর্ষণই নেই। মতামত হিসেবে যে রাসেলের মতের চেয়ে মিলিকানের মত মান্য এ কথা বলছি নে। কিন্তু এখানে কথা হচ্ছে একটা বিশেষ মনোভাব বৈজ্ঞানিকদের মনে কাজ করছে কিনা, এবং তাঁদের বৈজ্ঞানিক কাজের প্রেরণা যোগাচ্ছে কিনা। এ সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকদের সাক্ষ্যই অবশ্য সব চেয়ে প্রামাণ্য। তবে যদি রাসেল বলেন ও মনোভাব মিলিকানের মনে ঠিক রয়েছে শুধু তিনি 'Zিন্ত' পারছেন না'—সে কথা অবশ্য স্বতন্ত্র।

রাসেল যাকে বৈজ্ঞানিক মনোভাব বলেন তা যে একটা দার্শনিক তত্ত্বমাত্র, বিজ্ঞানের উৎস নয়—তার প্রমাণ তাঁর শোকের কারণ হ'ল যে উৎসের জোর কমেছে, কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে বিজ্ঞান-প্রবাহের প্রসার কি গভীরতা এক বিন্দুও কমে নি। বিংশ শতাব্দীর ফিজিক্স সম্বন্ধে মিলিকানের রায় হচ্ছে;—"I feel altogether confident that the historian of the future will estimate the past thirty years as the most extraordinary in the history of the world up to the present in the number and the fundamental charac-

(১) Three Great Elements in Human Progress : ১৮০—১৮২ পৃঃ।

ter of the discoveries in physics to which it has given birth. * * * There has been no period at all comparable with it unless it be the period about 300 years ago, which saw the development of Galilean and Newtonian mechanics." (২)। এর উল্টো কথা রাসেল অবশ্য বলেন নি, কারণ বলার উপায় নেই। বিজ্ঞানের মন্দিরে পূজারীরও সংখ্যা কমে নি, নৈবেদ্যের ভারও লঘু হয় নি। রাসেলের শোক ও শঙ্কার কারণ হচ্ছে তিনি ভুল দেবতার মন্দিরের দিকে চোখ চেয়ে আছেন। বৈজ্ঞানিক-দর্শন সম্বন্ধে আস্থা-হ্রাস রাসেল বিজ্ঞানে অধ্যাস ক'রে শোকাকুল হয়েছেন। "পুত্রভার্য্যাদিষু বিকলেষু সকলেষু বাহহমেব বিকলঃ সকলোবেতি বাহ্যধর্ম্মানাত্মন্যধ্যস্যতি"।

রাসেলের 'Is Science Superstitious?' নিয়ে আপনার আমার মধ্যে ছোট একটা তর্কের কথা একটু ব'লে সারি। হিউমের সংশয়বাদ সম্বন্ধে রাসেল যা বলেছেন আপনি তাকে বলেছিলেন বিজ্ঞানের দুরবস্থায় রাসেলের 'প্রকাশ্য ক্রন্দন'। আমি বলেছিলুম ওটা 'ছদ্ম বিদ্রূপ'। উত্তরে আপনি সন্দেহ করেছেন যে রাসেলের প্রবন্ধটা আমি মোটেই পড়েছি কিনা। মনে করেছিলুম ও সম্বন্ধে দুই এক কথা লিখবো, কিন্তু ভেবে দেখলুম তা নিরর্থক। কোনও লেখার মূল রসটা হাস্য না করুণ এটা শেষ পর্য্যন্ত রুচির কথা, যুক্তি-তর্কের নয়। এবং দেখছি আপনার আমার মধ্যে বেশ রুচিগত ভেদ রয়েছে। যেটা বিজ্ঞানের ক্ষেত্র নয় সেখানেও যে লোকে বিজ্ঞানের নামে শির নোয়ায় সেই প্রসঙ্গে আমি লিখেছিলুম, "এটা স্বাভাবিক। ওকালতি বা ভুষিমালের ব্যবসায় যে বড় হ'য়েছে, সাহিত্য সভায় তাকে আমরা নিত্য মোড়লি করতে দিচ্ছি।" ভেবেছিলুম একটা বিদ্রূপ করলুম। কিন্তু আপনার লেখা প'ড়ে জানলুম

(২) ঐ পুঁথি: The Last Fifteen years of Physics; ১১৪ পৃঃ।

যে ওটা 'মানব-মনের ব্যাপক দুর্ব্বলতার পক্ষে আমার সলজ্জ ওকালতি।' প্রথমটা একটু চম্‌কে গিয়েছিলুম, কিন্তু পরে বুঝলুম যে বিদ্রূপে আমার হাত নেই, আর ওকালতি আমার ব্যবসা; সুতরাং আমার মুখের বিদ্রূপ কারও কানে ওকালতির মত শোনানো বিচিত্র নয়।

(৫)

পুঁথি বেড়ে যাচ্ছে, আর একটা তর্কের প্রসঙ্গ দিয়েই শেষ করবো। আমি লিখেছিলুম, "বিংশ শতাব্দীর উদারপ্রাণ বৈজ্ঞানিকেরা যে ধর্ম্মের খাতিরে সৌরজগতের কেন্দ্রস্থলে সূর্য্যের অনধিকার প্রবেশ রদ করে সে স্থান পৃথিবীকে ফিরিয়ে দিচ্ছেন, এবং বাইবেলের সৃষ্টি-তত্ত্বই তত্ত্বকথা ব'লে মেনে নিচ্ছেন সে খবর এখনও পাওয়া যায় নি"। এ সম্বন্ধে আপনি লিখেছেন যে 'বিজ্ঞান এখনও পৃথিবীকেই সূর্য্যের চারিদিকে ঘোরাচ্ছে, সূর্য্যকে পৃথিবীর চারদিকে নয়' এ নিয়ে 'জাঁক' করাটা আমার ঠিক হয় নি। কারণ রিলেটিভিটি তত্ত্বানুসারে যখন সব গতিই আপেক্ষিক তখন 'অত্যাধুনিক বিজ্ঞান-অনুসারে পৃথিবী সূর্য্যের চারিদিকে ঘুরছে বলাও যতখানি সত্য, সূর্য্য পৃথিবীর চারিদিকে ঘুরছে বলাটাও অবিকল ততখানিই সত্য'। এ কথায় প্রথমত আপনার একটু শক্ লেগেছিল বটে, কিন্তু সাম্‌লে নিয়ে ভেবে বুঝেছেন 'যে কথাটা মিথ্যা নয়; এবং আমি যদি এ বিষয়ে এখনো পরাজয় স্বীকার না করি তবে নাচার'।

এ সম্বন্ধে আমার নিবেদন এই। প্রথমত সূর্য্য ও পৃথিবীর পরস্পর সম্পর্কে গতির কথা আমি ও জায়গায় কিছু বলিনি, বলেছি সৌরজগৎ সম্পর্কে তাদের পরস্পর অবস্থান সম্বন্ধে। দুটো ঠিক এক কথা নয়। কিন্তু সে কথা যাক্। রিলেটিভিটি-বাদের আপনার এ ব্যাখ্যা ও প্রয়োগে আশ্চর্য্য না হ'য়ে পারছি না। সব গতিই আপেক্ষিক—তার অর্থ এ নয় যে কোনও গতি সম্বন্ধে সব রকমের উক্তিই সমান শুদ্ধ বা সমান ভুল। ওর অর্থ হচ্ছে—কোনও গতি সম্বন্ধে কিছু বল্‌তে গেলেই সে কথা বল্‌তে

হয় একটা নির্দ্দিষ্ট frame of reference বা কাঠামো সম্পর্কে, না হ'লে গতি কথাটার কোনও অর্থই হয় না। যদি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডে কেবল একটি মাত্র বস্তু থাকতো তবে 'তার গতি' এ কথার কোনও অর্থ হ'তো না। যদি মাত্র দুটি বস্তু থাকতো তবে প্রথম বস্তুর গতি দ্বিতীয় বস্তুর দিকে, না দ্বিতীয় বস্তুর গতি প্রথম বস্তুর দিকে এ প্রশ্নেরও কোনও অর্থ থাকতো না, কারণ ও দুই-ই হ'তো এক কথা। অর্থাৎ যদি বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডে সূর্য্য আর পৃথিবী এই দুটি মাত্র বস্তু থাকতো তবে সূর্য্যের চার পাশে পৃথিবী ঘুরছে বা পৃথিবীর চারপাশে সূর্য্য ঘুরছে ও দুই-ই এক কথা হ'তো। কিন্তু ব্যাপার ত তা নয়, ওদুটি হচ্ছে অসংখ্য বস্তুর মধ্যে মাত্র দুটি। সুতরাং যখন ওদের গতি সম্বন্ধে কথা ওঠে তখন একটা frame of reference সম্পর্কে সে কথা বলতে হয়। সৌর-জগৎ হ'লো এই রকম একটা frame of reference বা কাঠামো। এর সম্পর্কে যখন সূর্য্য ও পৃথিবীর গতির কথা বলা হয় তখন সূর্য্যের চারপাশে পৃথিবী ঘুরছে বলা যা, পৃথিবীর চারপাশে সূর্য্য ঘুরছে বলা তা নয়। ওর প্রথম প্রতিজ্ঞা শুদ্ধ, দ্বিতীয় প্রতিজ্ঞা ভুল। আইন্‌ষ্টেনের রিলেটিভিটি কোপার্নিকাস্‌ ও কেপলারকে বাতিল করে নি। সৌরজগৎ সম্পর্কে অত্যাধুনিক বিজ্ঞানেও পৃথিবীই সূর্য্যের চারপাশে ঘুরছে, বিকল্পে সূর্য্য পৃথিবীর চারপাশে নয়। সৌর-জগৎ নিরপেক্ষ কে কার চারপাশে ঘুরছে? রিলেটিভিটির উত্তর—ও প্রশ্নের কোনও অর্থ হয় না। এরই নাম, সব গতিই 'রিলেটিভ' বা আপেক্ষিক, 'আবসলিউট' বা নিরপেক্ষ গতি ব'লে কোনও কিছু নাই, অর্থাৎ তার মানে হয় না।

গণিত শাস্ত্রে আমার জ্ঞান কিছুমাত্র নেই বল্‌লেই চলে। যদি ভুল কিছু ক'রে থাকি শুধরে দেবেন। নিবেদন ইতি।

গুণমুগ্ধ

শ্রীঅতুলচন্দ্র গুপ্ত।

পরিশিষ্ট

ফ্রান্সের নব মনোভাব। *

আমি সম্প্রতি New Era নামক মাদ্রাজ হ'তে প্রকাশিত একটি মাসিক পত্রে ইংরাজী ভাষায় একটি প্রবন্ধ লিখি। সে প্রবন্ধের নাম Future of Civilization. বলা বাহুল্য যে এ নাম আমার দত্ত নয়— এ নাম দিয়েছেন New Eraর সম্পাদক। ভবিষ্যদ্বাণী করা আমার পেশা নয়। তবে সম্পাদক মহাশয় যদি উক্ত প্রবন্ধের নাম দিতেন Future of our civilization, এবং তার পরে একটি প্রমাণসই জিজ্ঞাসা-চিহ্ন বসিয়ে দিতেন, তাহ'লে আমার আপত্তির বিশেষ কোন কারণ থাকত না। বাংলায় একটা কথা আছে—"ভাবতে পারিনে পরের ভাবনা লো"— ইউরোপ সম্বন্ধে আমার মনোভাব কতকটা ঐ গোছের।

উক্ত প্রবন্ধে আর পাঁচ কথার মধ্যে আমি এই কথা বলি যে,—

We Indians to-day hanker after a To-morrow which would be a facsimile copy of Europe's Today...Situated as we are, we cannot conceive of any other future. In the result, we fail to realise that Europe's Today will be its Yesterday, by the time we reach the desired goal.

আমাদের আদর্শ আগামী কল্য ইউরোপের গত কল্য হবে। কথাটা কতকটা বীরবলী গোছের শোনায়। অর্থাৎ ওর ভিতর যা আছে তার নাম শ্লেষ, আর নেই কোন সত্য। আমি কিন্তু কথাটা রসিকতাচ্ছলে

---

* ভারত-রোমক সমিতির অধিবেশনে পঠিত।

* 'বিচিত্রা' আশ্বিন, ১৩৩৩

বলিনি, কেননা আমার ধারণা যে ইউরোপীয় সভ্যতার ঘড়ির কাঁটা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ তারিখে থেমে যায়নি। এখনও তা চলছে এবং পূরোদমে চলছে। যে জাতির অন্তরে জীবনীশক্তি আছে, সে জাত যুগে যুগে জীবনে ও মনে নবকলেবর ধারণ করবে। এক মৃত ছাড়া আর কিছুই চিরস্থায়ী নয়। আর ইউরোপ যে জীবন্ত, তার প্রমাণ আমরা হাড়েমাসে পাচ্ছি। ইউরোপের মনের কাঁটা যে টলমল করছে, এর স্পষ্ট পরিচয় পাই আধুনিক ফরাসী সাহিত্যে। কি উপন্যাস, কি কবিতা, সকলেরই ভিতর একটা প্রচ্ছন্ন সুর কানে পড়ে, আর সে সুর হচ্ছে সন্দেহের সুর, ঊনবিংশ শতাব্দীতে আবিষ্কৃত অকাট্য সত্যের প্রতি অসন্তোষ ও অবজ্ঞার সুর। যেন ফ্রান্সের লোক এবিষয়ে সচেতন হয়েছে যে, নব সভ্যতার সোজা ও বাঁধা পথে তেড়ে চল্‌তে গিয়ে, তারা মনুষ্যত্বের কোনও কোনও অংশ হারিয়ে বসেছে। এবং তার ফলে সভ্য মানবের চিত্ত দীন ও চরিত্রহীন হ'য়ে পড়েছে। ইউরোপে যে ধনরত্ন প্রভূত পরিমাণে আছে, তা আমরা সকলেই জানি। বাঙলায় একটা প্রবাদ আছে যে "নিজের বুদ্ধি ও পরের ধন পৃথিবীতে কেউ কম দেখে না"। সম্ভবতঃ সেই কারণে আমরা ইউরোপের ঐশ্বর্য্য একটু বড় ক'রে দেখি। এবং সে ঐশ্বর্য্যলাভের লোভই হচ্ছে আমাদের নব ideality। সে যাই হোক, ইউরোপীয়েরা বলে যে তাদের মনে সুখও নেই, শান্তিও নেই। এই কারণে তারা যে বর্ত্তমানে শান্তির জন্য লালায়িত, তা ত সকলেই জানেন এখন মনের সুখ কি ক'রে তারা ফিরে পাবে, তার সন্ধানও অনেকে করছে। অনেকের ধারণা, যে-সব সত্য তারা হারিয়ে ফেলেছে, তা পুনরুদ্ধার করতে পারলেই তারা আবার জীবনে ও মনে সুস্থ ও সবল হ'য়ে উঠবে। যে মনোভাবকে মানুষে একবার মিথ্যে ব'লে পরিহার করেছে সেই মনোভাবকে আবার সার সত্য ব'লে অঙ্গীকার করার নাম বোধহয় reaction। কিন্তু ও-নামে ভয় পাবার কোনও কারণ নেই, কার

re-action'ও একরকম action, অপর পক্ষে in-actionই মানবজাতির সর্ব্বনাশের মূল; সে মানসিক in-actionএর নাম ইভলিউশানই দেও আর progressই দেও—তাতে কিছু আসে যায় না। মানব-সমাজ রেলের গাড়ী নয় যে, একরোখে একটানা গিয়ে সভ্যতার terminusয়ে পৌঁছবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, যে জাতির প্রাণ আছে তারা এগুতেও জানে, পিছুতেও জানে। ইউরোপের মন এখন কোন্ স্রোতের বিরুদ্ধে উজিয়ে চল্‌তে চেষ্টা কর্‌ছে, তার কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেষ্টা করব। আমি আজকে বিশেষ ক'রে নব ফরাসী-মনের যৎকিঞ্চিৎ পরিচয় দেব। কারণ এ সমিতির সকলেই ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচিত। অতএব যদি বলি যে ফরাসী সাহিত্যের প্রধান গুণ হচ্ছে তার স্পষ্টভাষিতা, তাহ'লে কেউ তার প্রতিবাদ করবেন না। ফরাসী জাতির মনের ভাবও স্পষ্ট, তাদের মুখের কথাও স্পষ্ট; এবং মনোরাজ্যে তারা সম্পূর্ণ নির্ভীক। সুতরাং ও-জাতির মনের ও মতের যখন যা পরিবর্ত্তন হয়, তখন তা তাদের সাহিত্যে স্পষ্ট ফুটে ওঠে। ফরাসী জাতি আধ-আধভাষী নয়। এর ফলে, ইউরোপে যখন যে ভাব জন্মগ্রহণ করে, তা স্পষ্ট রূপ লাভ করে ফরাসী সাহিত্যে।

বলা নিষ্প্রয়োজন যে, ফরাসী সাহিত্যের সঙ্গে অতি স্বল্প পরিচয়ের ফলে আমার পক্ষে ফরাসী জাতির নব মনোভাবের পরিচয় দিতে যাওয়া এক হিসেবে ঔদ্ধত্য মাত্র। পৃথিবীর কোন দেশেই সকল লোকের দেহের চেহারাও এক নয়, মনের চেহারাও এক নয়। ফলে সকলের মন ঠিক দিলেও তার ফলে এক মত বেরয় না। মনোজগতে তিল কুড়িয়ে তাল করা যায় না। সত্য কথা বলতে গেলে, অধিকাংশ লোকের নিজস্ব মত ব'লে কোনও পদার্থ নেই। যে সকল মতামত পরের কাছ থেকে প'ড়ে পাওয়া, তাই তাদের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করবার পক্ষে যথেষ্ট। বেশীর ভাগ লোক যদি মেষজাতীয় না হ'ত, ত সমাজ ব'লে কোন জিনিষ জন্মাত

না। আর যে স্বল্পসংখ্যক লোকের নিজস্ব মতামত আছে, তাদের মতামত বিভিন্ন হ'তে বাধ্য। কারণ অতি বুদ্ধিমান ও বিদ্বান লোকেরাও নিজের চরিত্র ও নৈসর্গিক প্রবৃত্তি অনুসারে নিজস্ব মত গ'ড়ে তোলেন। অবশ্য পৃথিবীতে দু-শ্রেণীর লোক আছে, যাঁরা সকলকেই নিজ মতাবলম্বী করা তাঁদের কর্ত্তব্য বলে' মনে করেন। এক দল হচ্ছেন ধর্ম্মাচার্য্য, আর এক দল হচ্ছেন বিজ্ঞানাচার্য্য। কারণ উভয়েরি বিশ্বাস যে, জগতের মূল সত্য তাঁদের করায়ত্ত। এবং তাঁদের কথা বেদবাক্য ব'লে মানলেই মানবজাতি উদ্ধার হ'য়ে যাবে। ইউরোপের অধিবাসীরা সেকালে এই ধর্ম্মযাজকদের বশীভূত ছিল, এবং একালে এই বিজ্ঞানাচার্য্যদের বশীভূত হয়েছে। এই উভয় শ্রেণীর লোকই সর্ব্বজ্ঞতার দাবী করে। এবং যেহেতু বিজ্ঞান একালে সর্ব্বশক্তিমান, সে-কারণ বৈজ্ঞানিকদেরও সর্ব্বজ্ঞ ব'লে মান অনেকের পক্ষে স্বাভাবিক। এ ক্ষেত্রে যে স্বল্পসংখ্যক লোক মনোজগতে স্বাধীনতা চায়, তারাই কলমের জোরে জাতির মনের মোড় ফেরায়। সুতরাং স্বল্পসংখ্যক সাহিত্যিকদের মতামত উপেক্ষণীয় নয়। এই শ্রেণী লোকের মনোভাবকে আমি ফ্রান্সের নব মনোভাব আখ্যা দিয়েছি। এ স্বল্পসংখ্যক লোকদের যে মনোভাবের পরিচয় সাহিত্যে পাওয়া যায়, তা থেকে এ অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, ফরাসী জাতির ভাবের পরিবর্ত্ত ঘটেছে।

সম্প্রতি La Renaissance Religieuse নামক একখানি ফরা পুস্তক আমার হস্তগত হয়েছে। সেই পুস্তকের সাহায্যেই এই নূত মনোভাবটি যে কি, তার সন্ধান নেবার চেষ্টা করব। এই বইখানি প্রায় বিশজন লেখকের বিশটি প্রবন্ধ আছে। এবং এঁদের মধ্যে অনেকে দার্শনিক হিসেবে, নভেলিষ্ট হিসেবে, প্রবন্ধকার হিসেবে খ্যাতনামা লেখক এঁদের অবশ্য সকলের ধর্ম্মমত এক নয়, কেন না এঁদের মধ্যে কে Catholic, কেউ Protestant, কেউ ইহুদি, কেউ আবার Orientalis

কিন্তু এক বিষয়ে সকলের মনের গতি একই দিকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতার দিকে সকলেই পিঠ ফিরিয়েছেন। Laicismeএর বিরুদ্ধে সকলেই বিদ্রোহ ঘোষণা করছেন। Laicismeএর ভাল বাঙলা কি? ঐহিকতা? কিন্তু ঐহিকতার অর্থ কি? আমার বিশ্বাস সর্ব্বদর্শন সংগ্রহের বক্ষ্যমান কথা কটির ভিতর তার পুরো অর্থ পাওয়া যায়।

"যাঁহারা লৌকিক বাক্যের বশবর্ত্তী হইয়া নীতি ও কাম শাস্ত্রানুসারে, কাম ও অর্থকেই পুরুষার্থ বলিয়া স্বীকার করেন, পারলৌকিক অর্থ স্বীকার করেন না, সেই সকল চার্ব্বাকমতানুবর্ত্তীরাই এইরূপ অনুভব করিয়া থাকেন, এই নিমিত্তই চার্ব্বাক মতের 'লোকায়ত' এই অপর নামটি সার্থক হইয়াছে।"

বর্ত্তমান ইউরোপের লোকায়ত মত যে একই মত, একটি ফরাসী লেখকের কথা থেকেই তা স্পষ্ট বোঝা যায়। তিনি laicismeএর বক্ষ্যমাণ পরিচয় দিয়েছেন—

Laicisme হচ্ছে একটি বিশেষ systeme doctrinal et conceptual, de plus en plus repandue chez toutes les nations de l'ancien et du nouveau monde। আর এ নতুন doctrine কি? La religion de la science, la religion du progres, la mystique des droits du proletariat, la mystique de l'emancipation des peuples, et en general la religion de l'humanite। বলা বাহুল্য এ সবই হচ্ছে নীতিশাস্ত্র ও অর্থশাস্ত্রের, politics এবং economics সাধনার মন্ত্রতন্ত্র।

ফ্রান্সের এই নব চিন্তার ধারার দুটি মুখ আছে। প্রথমতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতি অনাস্থা, দ্বিতীয়তঃ ধর্ম্মের সত্যের প্রতি আস্থা। প্রথম মনোভাবটি negative, দ্বিতীয়টি positive। আজকে আমি এই negative মনোভাবেরই পরিচয় দেব; কারণ positive

দিকটির পরিচয় দিতে হলে, intuition, mysticism প্রভৃতি দার্শনিক তত্ত্বের বিচার করতে হয়। সে বিচার সকলের সহ্য হবে না; বিশেষতঃ অবৈজ্ঞানিক এবং অদার্শনিক বক্তার মুখে শুনলে।

আমি পূর্ব্বেই বলেছি ধর্ম্ম সম্বন্ধে প্রবন্ধলেখকেরা সকলে একমত নন্। তাতেই প্রমাণ হয় যে, বহু লোকে ধর্ম্মের বিষয় চিন্তা করতে আরম্ভ করছেন, এবং সে চিন্তা স্বাধীন চিন্তা, কোনও বাঁধাধরা মতের পুনরুল্লেখমাত্র নয়। খ্যাতনামা নভেলিষ্ট Ramon Fernande intuition শব্দের যে ব্যাখ্যা করেছেন, Bergsonর intuitionএর অ অবশ্য তা নয়। Fernandezএর মতে intellect জানে আর intuitio চেনে। এ দুয়ের প্রভেদ যে কি, তা বুঝলেন? কিন্তু উভয়ের মিল এ জায়গায় যে, উভয়ের মতেই intellect সত্যের জ্ঞানলাভের একমাত্র য নয়। অপর পক্ষে তাঁদের negative মনোভাবের যথেষ্ট মিল আছে সকলেই একই কথা বলছেন—অবশ্য বিভিন্ন ভাষায়। সুতরাং তাঁদে একজনের মতামত আপনাদের শোনাব—তার থেকেই আপনারা এ নূতন মনোভাবের সন্ধান পাবেন। আমি এমন একটি লেখকের ক আপনাদের শোনাতে চাই যাঁর কথা অতি স্পষ্ট এবং যাঁর মনে কোন কিন্তু-কিন্তু নেই। এও হয় ও-ও হয়, এমন কথা বলায় সম্ভব সুবিবেচনার পরিচয় দেওয়া হয়, কিন্তু সে কথার পিছনে লেখবে ব্যক্তিত্বের পরিচয় পাওয়া যায় না। এবং যে লেখার অন্তর থেকে লেখ ফুটে না ওঠেন, সে কথা লোকের মনে বসে না।

আমি এ স্থানে যাঁর মতের পরিচয় দেব; তাঁর নাম Pa Archambault। ইনি কে আমি জানিনে, কিন্তু লেখা প'ড়ে মনে লেখক একজন অধ্যাপক; এবং সম্ভবতঃ দর্শনশাস্ত্রের। তিনি লিখেছে "গত দশ বিশ বৎসরের মধ্যে ধর্ম্মমনোভাব scientisme নামক মনোভা পরাভিভিক্ত হয়েছে, এবং অতি শীঘ্রই যে তা sociologisme না

শাস্ত্রেরও মূল উচ্ছেদ করবে, তার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে। এই সব মত যে আসলে অমূলক, তাই প্রমাণ করা আমাদের দেশের নব চিন্তার negative অংশ।

"Scientisme একদম বাতিল হ'য়ে গিয়েছে। Scientisme বলতে কি বোঝায়? সেই মত, যে মতানুসারে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানই মানুষের একমাত্র জ্ঞান, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিকরা যে সকল postulates এবং hypothesisএর উপর বিজ্ঞানশাস্ত্র গ'ড়ে তুলেছেন, সেই postulate ও hypothesisকে ধ্রুবসত্য বলে বিশ্বাস করা, আর যে সত্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে জানা না যায়, সে সত্যকে মিথ্যা জ্ঞানে পরিহার করা, এবং যা বিজ্ঞানের বহির্ভূত তাকেই অলীক সাব্যস্ত করা, ফলে quality, personality, liberty, morality প্রভৃতি মানবধর্ম্মকে অবজ্ঞার সঙ্গে প্রত্যাখ্যান করা।

"সকলেই জানেন এই মত Renan, Taine এবং Berthelotএর প্রসাদে গত শতাব্দীতে লোকের মনের উপর কিরূপ একাধিপত্য লাভ করেছিল। কিন্তু উক্ত মতের গোড়া আলগা ক'রে দিয়েছে ধর্ম্মযাজকেরা নয়—পরবর্ত্তী দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিকেরা। একদিকে Boutroux এবং Bergsonএর ন্যায় দার্শনিক, আর অপর পক্ষে, Poincare, Duhem, Milhaud, Le Roy প্রভৃতি গণিতশাস্ত্র ও পদার্থবিজ্ঞানের জগৎপূজ্য গুরুরা।"

Archambaultএর এ কথা যদি সত্য হয়—আর এ কথা যে সত্য সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই—অন্ততঃ তাঁর মনে, যিনি Bergsonএর Creative Evolution এবং Poincare'র Science et Hypothesis নামক গ্রন্থদ্বয়ের সঙ্গে সুপরিচিত—তাহ'লে দাঁড়াচ্ছে এই যে, scientismeএর সঙ্কীর্ণ গণ্ডী থেকে সমাজের মনকে মুক্তি দিয়েছে Science।

Religion scienceএর সঙ্গে কিছুদিন লড়েছিল বটে, কিন্তু সে যুদ্ধে religionএর সম্পূর্ণ হার হয়েছিল। খৃষ্টধর্ম্মের পুরোহিতের দলের পক্ষে বাইবেল হাতে বিজ্ঞানের সঙ্গে লড়াই, ইংরাজের বিরুদ্ধে তিতু মিয়ার লড়ায়ের মত হাস্যকর ব্যাপার। কিন্তু সম্প্রতি Einstein দেশের মধ্যে কাল ঢুকিয়ে, পদার্থ-বিজ্ঞানের সাজানো তাস যেরকম ভেস্তে দিয়েছেন, তাতে ক'রে সে তাসের সাহায্যে আর ধর্ম্মকে হেলায় বাজিমাৎ করা চলে না।

Bergson এবং Poincare প্রভৃতির দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মতামত যে আমাদের মত অবৈজ্ঞানিক ও অদার্শনিক লোকের নিকট সত্য ব'লে গ্রাহ্য হয়েছে শুধু তাই নয়। ফ্রান্সের বৈজ্ঞানিক মহলেও এঁদের মতামত বৈজ্ঞানিক গোঁড়ামি নষ্ট করেছে। এ বিশ্বের রহস্য উদ্‌ঘাটন করবার একমাত্র চাবি যে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি নয়, এ জ্ঞান বহু বৈজ্ঞানিকেরও হয়েছে। সম্প্রতি ফ্রান্সের Figaro নামক দৈনিক পত্রে Academie des sciences এর সভ্যবৃন্দ এবিষয়ে তাঁদের মত প্রকাশ করেছেন। তার থেকে দেখা যায় যে, এযুগের বৈজ্ঞানিকরা প্রায় সকলেই একমত যে Science এবং religion উভয়েই সমান সত্য, কারণ সত্যে পৌঁছবার দুটি পথ মনোজগতে আছে—একটি বিজ্ঞানের পথ, অপরটি ধর্ম্মের পথ। এর একটির দোহাই দিয়ে অপরটি বন্ধ করবার চেষ্টাই আহম্মকি। আমাদের দেশের ভাষায় ব্যবহারিক সত্যের দোহাই দিয়ে অনুভব-সিদ্ধ সত্যকে মিথ্যা ব'লে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। এই scientismeএর বাধামুক্ত হ'য়ে ফরাসীমন আবার ধর্ম্মের পথে অগ্রসর হবার জন্য ব্রতী হয়েছে। এ ব্রত যার খুসি সেই উদ্‌যাপন করতে পারে। কেউ তাকে আর মূর্খ বলবে না। এর থেকে কেউ যেন মনে করেন না যে, ফ্রান্সের লোক এখন পাঁচবক্ত্ নমাজ করতে ব'সে গিয়েছে। মানুষের প্রকৃতি এ নয়, যে চিন্তার ধারার সঙ্গে সঙ্গেই তার জীবনের ধারা বদলে যায়। বিশেষতঃ সেই সকল লোকের, scientisme যাদের মগ্ন চৈতন্যে

থিতিয়ে বসেছে। পৃথিবীর আজকের দিনে যে political ও economic অবস্থা দাঁড়িয়েছে, তাতে ক'রে ইউরোপের কোন জাতির পক্ষেই মধ্যযুগে ফিরে যাওয়া একেবারে অসাধ্য। বিজ্ঞান ইউরোপের হাতে যে আলাদিনের প্রদীপ দিয়েছে, সে প্রদীপ যে তারা ছুঁড়ে ফেলে দেবে, ইউরোপের লোক এতদূর কাণ্ডজ্ঞানহীন নয়। এবং সে প্রদীপের আলোয় তাদের জীবনের সুপথ দেখাবে। Scientisme বাতিল হ'তে পারে, কিন্তু scienceএর উত্তরোত্তর উন্নতি হবে। Science যেমন মানুষের অশেষ উপকার করেছে, তেমনি তার ঐকান্তিক চর্চ্চার কতকগুলো কুফলও ফলেছে—যথা, সামাজিক জীবনে industrialismএর আতিশয্য ও ধনীর নব feudalism ইত্যাদি, এবং মানসিক জীবনে ঐহিকতা। Science রক্ষা ক'রে তার এই সব কুফল কি ক'রে দূর করা যায়—এই হচ্ছে ইউরোপের একালের প্রধান সমস্যা। তাই কেউ সমাজকে ঢেলে সাজতে চান, কেউ আবার মনকে মুক্তি দিতে চান। জীবন মনকে তৈরি করে, কিম্বা মন জীবনকে তৈরী করে, তা আমি বলতে পারিনে। তবে এ কথা সত্য যে, কোনও জাতির মন যখন বদলায়, তখন তার সভ্যতা যে নবরূপ ধারণ করবে, এরূপ অনুমান অসঙ্গত নয়। এই কারণেই আমি আপনাদের কাছে ফ্রান্সের নব মনোভাবের পরিচয় দিতে উদ্যত হয়েছি। ইউরোপীয় সভ্যতা যে ঠিক কি রূপ ধারণ করবে বলা অসম্ভব, কিন্তু তার বর্ত্তমান রূপ যে থাকবে না—এ কথা সাহস ক'রে বলা যায়।

যদি বলেন যে জনকতক লেখকের মন থেকে জাতীয় মনের সন্ধান পাওয়া যায় না, তাহ'লে আমার উত্তর—এ কথা ঠিক। Conservatism মানুষের মজ্জাগত। Religious conservatism গত শতাব্দীতেও চ'লে যায় নি, এবং scientific conservatives বর্ত্তমান ফ্রান্সে প্রবল পক্ষ নয়। কোনও ফরাসী Bertrand Russellএর ন্যায় die-hard লেখকের সাক্ষাৎ আমি এযুগের ফরাসী সাহিত্যে পাইনি।

আমরা যাকে নতুন মনোভাব বলি, তা অবশ্য পুরোনো মনোভাবের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন অথবা বিভিন্ন নয়। ক্ষণিক বিজ্ঞান যেমন মনের ধর্ম্ম নয়, ক্ষণিক জীবনও তেমনি প্রাণের ধর্ম্ম নয়। মানুষ দেহমনে ক্ষণে মরে ক্ষণে বাঁচে, এমন কথা পাগলের প্রলাপ মাত্র। মানুষের দেহ যেমন যুগে যুগে নূতন রূপ ধারণ করে, অথচ চিরজীবন তার একটা পুরোনো-কাঠামো থেকে যায়; মানুষের মনও তেমনি যুগে যুগে নূতন রূপ ধারণ করে, কিন্তু তার অন্তরে একটা বিশিষ্ট কাঠামো থেকে যায়। আমরা বিশ্বাস করতে ভালবাসি যে, মানুষ মাত্রেই স্বভাবতই কতক বিষয়ে সমধর্ম্মী। এ বিশ্বাস যাঁর নেই, তাঁর মুখে "মানবজাতি" কথাটা নিরর্থক।

তেমনি আবার বিভিন্ন জাতির ও মনেরও অল্পবিস্তর প্রভেদ আছে। সব জাতির মন একই পথে একই চালে চলে না। এ জাতিগত বৈচিত্র্যের জন্য প্রতি জাতির ইতিহাস দায়ী। মানুষের মন একেবারে সাদা কাগজ নয়, যে যার যা খুসি সেই তার উপরে নূতন রচনা করবে। ও কাগজের উপরে জাতির ইতিহাস এমন অনেক কথা লিখে গিয়েছে যা' একেবারে মুছে ফেলা যায় না। এই সত্যটি উপেক্ষা ক'রেই গত শতাব্দী, ইউরোপের মনের নবরচনা করতে বসেছিল। ফলে আজকার ইউরোপের মনে যে তার যুগসঞ্চিত ধর্ম্মভাব মাথাঝাড়া দিয়ে উঠবে—এতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নেই। সে মনোভাব জাতির অন্তরে কখনই মরেনি, সুধু ম্রিয়মাণ হ'য়ে পড়েছিল, এখন হয়ত আবার পুনর্জ্জীবিত হ'য়ে উঠেছে। আমাদের দেশেও পুরাকালে নানারকম বাহ্যধর্ম্ম বৈদিকধর্ম্মকে আচ্ছন্ন করেছিল, এবং সে ধর্ম্মের পুনরুত্থানের সময় মেধাতিথি ব'লে গিয়েছেন যে—"বাহ্যধর্ম্মাস্তু সর্ব্বে মূর্খদুঃশীল-পুরুষ-প্রবর্ত্তিতাঃ কিয়ন্তং কালং লব্ধাবসরাঘপি পুনরস্তধায়ন্তে। নহি ব্যামোহো যুগ সহস্রানুবর্ত্তী ভবন্তি"। অবশ্য ইউরোপে আজকের দিনে কেউ মেধাতিথির মত কটু কথা বলবেন না। তাঁরা এই পর্য্যন্ত বলতে প্রস্তুত—নহি ব্যামোহো যুগসহস্রানুবর্ত্তী ভবন্তি। Scientisme-

এর ব্যামোহ কাটিয়ে উঠলে, ফরাসী-মন ফরাসী-মনই থাকবে—জার্ম্মান-মন হবে না।

পুরাকালে ভারতবর্ষে বাহ্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে যাঁরা লেখনী ধারণ করেছিলেন, তাঁদের হাতে বৈদিক-ধর্ম্ম যেমন বৈদান্তিক ধর্ম্ম হ'য়ে উঠেছিল; আমার বিশ্বাস ইউরোপের এই নব ধার্ম্মিকদের হাতে খৃষ্টান ধর্ম্মও নব-রূপ ধারণ করবে। বৈদান্তিক দর্শনের বিশেষত্ব এই যে, তার অন্তরে গোটা বৌদ্ধ দর্শন গা-ঢাকা দিয়ে রয়েছে। আর আমার বিশ্বাস ফ্রান্সের এই নূতন ধর্ম্ম-মনোভাব, scienceএর সকল সত্যই অঙ্গীকার করবে। এ অনুমানের কারণ কি, তা বলছি।

Jacques Chevalier নামক জনৈক যুগপৎ দার্শনিক এবং নিষ্ঠাবান Catholic বলেছেন যে—St. Thomasএর দর্শনে আমাদের পক্ষে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। তার প্রথম কারণ তিনি scienceএর কিছুই জানতেন না, দ্বিতীয়তঃ গত ছ' শ' বৎসরের ভিতর ইউরোপে যে দার্শনিক চিন্তার স্রোত ব'য়ে গিয়েছে, তা উপেক্ষা করা শুধু মূর্খতা নয়—অসম্ভব। ইউরোপের এই নিকট অতীত আমাদের মনের এত পরিবর্ত্তন ঘটিয়েছে যে, সে পরিবর্ত্তন অস্বীকার ক'রে আমরা কোন সত্যেরই সাক্ষাৎ লাভ করব না। St. Thomas যদি আজকের দিনে সশরীরে উপস্থিত থাকতেন, এবং বর্ত্তমানের সকল জ্ঞানবিজ্ঞানের ভিত্তির উপর নূতন দর্শন গ'ড়ে তুলতেন, তাহ'লেই তাঁর ব্রহ্মজিজ্ঞাসা ও তার মীমাংসা আমাদের কাছে গ্রাহ্য হ'ত। আমাদের নূতন ধর্ম্মভাব কোনও অন্ধ বিশ্বাসের আশ্রয়ে প্রাণধারণ করতে পারবে না। ভগবানের বিশ্বাস তখনই আমাদের অটল হবে—যখন আমরা লজিকের ভিত্তির উপর সে বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারব। এ হচ্ছে খাঁটি ফরাসী মনের কথা, কারণ ফরাসীরা হচ্ছে মূলতঃ নৈয়ায়িকের জাত। বাণভট্ট আমাদের দেশের নৈয়ায়িকদের ঠাট্টা ক'রে বলেছেন যে তারা সব ঈশ্বর-প্রামাণিক। সুতরাং ফরাসী জাতের ধর্ম্মবুদ্ধি

জাগ্রত হ'লে তারাও যে ঈশ্বর-প্রামাণিক হ'য়ে উঠবে, তাতে আর আশ্চর্য্য কি? তবে বৈদান্তিকরা এ কথা শুনে হেসে বল্‌বে বহুত আচ্ছা! তোমরাও ফরাসীদের দলের লোক। তবে কথা হচ্ছে এই যে—ঈশ্বর প্রমাণের বিষয় নন্। যা স্বতঃসিদ্ধ, তার আবার প্রমাণ কি? আর বৈদান্তিক সকল দেশেই আছে, কেননা বেদান্ত একটা শাস্ত্র নয়, ও একরকম বিদ্যা। আমি পূর্ব্বে বলেছি যে, প্রতি জাতির মনের একটা বিশেষ দিকে ঝোঁক আছে। ফরাসী জাতির মনকে Descartes যে পথ দেখিয়ে গিয়েছেন, সেই পথেই ফরাসীমন অদ্যাবধি চ'লে আসছে এবং সেই পথেই সহজে চলতে পারে। সে পথ হচ্ছে আলোর পথ। ছায়ার পথে ফরাসীমন ফুর্ত্তি ক'রে অগ্রসর হ'তে পারেনা। এই কারণেই ফরাসী পদ্য-সাহিত্য এত দরিদ্র, এবং ফরাসী গদ্য-সাহিত্য এত ঐশ্বর্য্যবান। আমরা যাকে scientific philosophy বলি, তার প্রবর্ত্তক Descartes, Newton নন্। Descartes বলেছিলেন "Give me matter and motion, and I will build the universe." যাকে scientific philosophy বলে, তা এই বিশ্ব গ'ড়ে তোলবার নব-দর্শন; এবং উনবিংশ শতাব্দীতে যে এই নূতন দর্শন সর্ব্বাঙ্গসুন্দরভাবে গ'ড়ে উঠেছিল, সেও ফরাসীদেরই হাতে। Scientismeএর খণ্ডন যে ফ্রান্সে গ্রাহ্য হয়েছে, তার কারণ নূতন Science-এই তার মূলে কুঠারাঘাত করেছে। অপর পক্ষে এক দলের লেখক যে St. Thomasএর দর্শনের দিকে ঝুঁকেছে, তার কারণ St. Thomas আর কিছু না হন—চমৎকার logician। তিনি religionকে scienceএ পরিণত করেছিলেন।

কি করে religion ও science উভয়ই রক্ষা করা যায়, এই হচ্ছে বর্ত্তমান ফরাসী মনের সমস্যা। এ ক্ষেত্রে অনেকে Pascalএর মীমাংসার উপরই নির্ভর করছেন। Pascal বলেছেন যে কেবলমাত্র reasonএর উপর নির্ভর করে, সকল সত্যের সে সাক্ষাৎ পায় না; অপর পক্ষে যে

কেবলমাত্র unreason-এর উপর নির্ভর করে, সে সকল মিথ্যারই সাক্ষাৎলাভ করে।

ফলে ফরাসীমন unreasonকে বরণ করতে প্রস্তুত নয়, reasonএর নাগালের বাইরেও যে সত্য আছে, সেই সত্যেরই তারা সন্ধান করছে।

Scienceএর কোনও ভিত্তি নেই, বৈজ্ঞানিক জগৎ যে গণিতশাস্ত্রীদের মনগড়া একটা কল্পপুরী, এ কথায় ফরাসীমন সায় দেয় না। Descartes, Geometryকে Algebraয় রূপান্তরিত করেছিলেন। গণিতশাস্ত্রে তাঁর এ কীর্ত্তি 'অপূর্ব্ব', সুতরাং যে গণিৎ Descartes গড়েছেন, সে গণিতের সাহায্যে Science যে ভানুমতীর বাজি দেখিয়েছে, তার অন্তরে যে কোনও reality নেই—এ কথা ফ্রান্সের বিশ্বস্ত Catholicও স্বীকার করতে কুণ্ঠিত। তাই Archambault বলেছেন—

Scienceএর মূলে যে কতকগুলি postulate মাত্র আছে, এ কথা শুনে অনেকে সহজেই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হবে যে, science একটা ঐন্দ্রজালিকের ভেল্কি মাত্র। এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। Meyerson দেখিয়ে দিয়েছেন যে, Science-এর অন্তরেও ধ্রুবসত্য আছে। Meyerson হচ্ছেন একাধারে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক। তাঁর দর্শনের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই, থাকলেও তাঁর কথা বোঝা আমার সাধ্যের অতীত। তবে তাঁর শিষ্য Andre Metz নাকি এক কথায় Meyersonএর সিদ্ধান্ত বুঝিয়ে দিয়েছেন। Metz লিখেছেন Meyersonএর সিদ্ধান্তের সঙ্গে Pascalএর সিদ্ধান্তের কোনও প্রভেদ নেই। মানুষ সৃষ্টির গোড়ার কথাও জানে না, শেষ কথাও জানে না; জানে শুধু ইতিমধ্যের কথা। এ সত্য কি গীতার একটি শ্লোকের অক্ষরে অক্ষরে অনুবাদ নয়?

"অব্যক্তাদীনী ভূতানি ব্যক্তমধ্যানি ভারত
অব্যক্তনিধনান্যেব তত্র কা পরিদেবনা॥"

মানবমনের যে শক্তি এ ব্যক্তমধ্যের জ্ঞান লাভ করে, সেই শক্তিই বৈজ্ঞানিক মনের একমাত্র শক্তি; এবং যে শক্তির সাহায্যে অব্যক্তের সন্ধান পায়, সেই শক্তির উপরই ধর্ম্ম প্রতিষ্ঠিত। অতএব science religionএর হন্তারক নয়।

বর্ত্তমান ফরাসী মনীষীদের এ সব কথা শুনে মনে হয় যে, তাঁদের নূতন মনোভাব আসলে তাঁদের পূর্ব্ব-মনোভাব। অর্থাৎ Descartesএর আশ্রয় ছাড়লে তাঁরা Pascalএর ক্রোড়ে আশ্রয় নেন্। আর Descartes এবং Pascal মনোজগতে একই জাতের লোক, এ দুয়ের কেউ Un-reasonকে আসন দিতে প্রস্তুত নন্।

আমি এ প্রবন্ধে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও ইউরোপীয় দার্শনিক ও বৈজ্ঞানিক মতামতের উল্লেখ করতে বাধ্য হয়েছি। আমি যে স্বেচ্ছায় ও গুরুতর বিষয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত হইনি, তার কারণ আমি জানি যে সে আলোচনা আমার পক্ষে অনধিকারচর্চ্চা। তবে যে, দর্শনবিজ্ঞানের একেবারে পাশ কাটিয়ে যেতে পারিনি, তার কারণ ফ্রান্সের মন গত তিনশত বৎসরের দর্শনবিজ্ঞানই গ'ড়ে তুলেছে। ফ্রান্সের নতুন মনোভাব এই বিজ্ঞানশাসিত মন থেকেই উদ্ভূত হয়েছে। বিজ্ঞানের দিকে পিঠ ফিরিয়ে কোনও সত্যের সন্ধান করা ফরাসীমনের পক্ষে অসম্ভব। ধর্ম্মবিশ্বাসকে মনে যদি স্থান দিতে হয় ত তা করতে হবে বিজ্ঞানের অবিরোধে—এই হচ্ছে ফরাসীমনের আসল কথা। অর্থাৎ স্বর্গে যেতে হ'লে বিজ্ঞানের সিঁড়ি ভাঙতে হবে। ইংরাজীতে একটি কথা আছে যে—where ignorance is bliss, 'tis folly to be wise. আমাদের দেশে বহু ধার্ম্মিক লোক এ কথায় সায় দেবেন, কিন্তু আমার বিশ্বাস ফরাসী-দেশে যাঁরা মনের কারবার করেন, তাঁরা এ মতকে প্রত্যাখ্যান করতে দ্বিধা করবেন না।

আর এক কথা। একটি বিশেষ মনোভাবকে আমি এ প্রবন্ধে বরাবর religious বলছি। কিন্তু যে পুস্তক অবলম্বনে আমি এ প্রবন্ধ রচনা করছি, সে পুস্তকে কোন কোন লোক বলেছেন যে যদি religious শব্দের পরিবর্ত্তে spiritual শব্দ ব্যবহার করা যায়, তা'হ'লেই বর্ত্তমান মনোভাবের স্বরূপ ঠিক বোঝা যায়। যথার্থ religious লোক যে spiritual নন্—এমন কথা কেউ বলেন না। কিন্তু বহু লোক spiritual হ'য়েও, religious না হ'তে পারে। কারণ religious শব্দের সকল দেশেই একটি সঙ্কীর্ণ অর্থ আছে, এবং সে অর্থে religious হওয়া অনেকের পক্ষে অসম্ভব। এ ক্ষেত্রে "আমি বিশ্বাস করি" আর "আমি বিশ্বাস করিনে" এই দুই উক্তিই সমান মনুষ্যত্বের পরিচায়ক। কারণ এ বিশ্বাস অবিশ্বাস দুইই spiritual স্বাধীনতার পরিচায়ক। বিশ্বাস ও অবিশ্বাসের মধ্যে মনকে ত্রিশঙ্কুর মত ঝুলিয়ে রাখা নাকি কাপুরুষের ধর্ম্ম। ফ্রান্সের এই নূতন মনোভাবের ফরাসীজীবনের উপর কোনও প্রভাব হয়েছে কি না জানিনে, কিন্তু আধুনিক ফরাসী-সাহিত্য এ প্রভাবমুক্ত নয়।

যদি চল্লিশ বৎসর পিছু হ'টে যাওয়া যায় ত দেখা যাবে যে, সেকালের সাহিত্যের উপর Scientismeএর প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। Zola প্রমুখ naturalist লেখকেরা religion of scienceএর গোঁড়া ভক্ত; আর Anatole France হচ্ছেন সে scientific scepticismএর পূর্ণ অবতার।

কিন্তু সে দেশের হাল্ সাহিত্যের ভিতরে একটি নূতন সুর কানে বাজে। এ সুরের নাম spiritual ছাড়া আর কি দেব জানিনে। এ সুর অবশ্য অতি ক্ষীণ; তবুও কান এড়িয়ে যায় না। ফ্রান্সে যাঁদের neo-romantics বলে, তাঁদের রচিত সাহিত্যে এই spiritual সুর অপেক্ষাকৃত স্পষ্ট। কিন্তু Proustএর মত লেখক, যাঁর লেখায় কোন রকম ফিলজফির সন্ধান পাওয়া যায় না, তাঁর লেখা পড়্তে আমার মনে

হয় যে লেখার ভিতর থেকে Bergson উঁকিঝুঁকি মারছে, এমন কি তাঁর প্রাকৃতিক বর্ণনাতেও। আর তিনি সঙ্গীত সম্বন্ধে তাঁর নভেলে যে, ক'টি অপূর্ব্ব সুন্দর কথা বলেছেন, তা যে intuition-লব্ধ, সে বিষয়ে তিলমাত্র সন্দেহ নেই। Intuition মানলেই mysticism মান্‌তে হয়। Mysticism কথার বাঙলা প্রতিশব্দ আমি জানিনে। সনৎকুমার নারদকে বলেছিলেন যে "তুমি অতিবাদী হও আর লোকে যদি বলে তুমি অতিবাদী, তার উত্তরে বলো যে হাঁ আমি অতিবাদী।" (ছান্দোগ্য উপনিষৎ)। এই "অতি"বস্তুটির সাক্ষাৎ science তার গণ্ডীর মধ্যে পায় না, অতএব তার অস্তিত্ব অস্বীকার করতে science ন্যায়ত বাধ্য। আমার মনে হয় যে, Bergson এই অতিবাদকে মুক্তি দিয়েছেন। কথাটা খুব স্পষ্ট হ'ল না, কেননা "অতিকে" পূর্ণ আলোকে আনা যায় না, অথচ অনেকের মন তার সাক্ষাৎ পায়। ফ্রান্সের নব মনোভাবের অন্তরে আছে মনোজগতে নূতন মুক্তির আনন্দ। অবশ্য এর উল্টো মনোভাবও সে দেশের সাহিত্যে যথেষ্টর চাইতেও বেশি আছে, কিন্তু সে চলতি মনোভাব— তার অন্তরে কিছুমাত্র নূতনত্ব নেই। ইউরোপের মনের গতি নূতন দিকে যাচ্ছে, আমার এ অনুমান যদি সঙ্গত হয়, তাহ'লে ভবিষ্যতে আমাদের সভ্যতার To morrow যে ইউরোপীয় সভ্যতার Yesterday হ'য়ে যাবে, এ আশঙ্কা সহজেই মনে উদয় হয়। না ভেবেচিন্তে ইউরোপীয় সভ্যতার পিছনে ছুটলে, আমাদের হয়ত যুগে যুগে মনকে ডিগবাজি খাওয়াতে হবে। আর মনের ঘুঁটি বার বার কাঁচলে সভ্যতার খেলায় বেশি এগোনো যায় না।

আমি বিশেষ ক'রে ফ্রান্সের নবভাবের পরিচয় দিতে চেষ্টা করেছি; কিন্তু সত্য কথা এই যে, সমগ্র ইউরোপে চিন্তার ধারা এখন উজান ভাবে বইছে। Whitehead, Eddington, Haldane, Macdougal প্রভৃতি বিলাতের খ্যাতনামা বৈজ্ঞানিকরা একই সুর ভাঁজছেন; কেউ মিঠে সুরে,

কেউ আবার চড়া আওয়াজে। বৈজ্ঞানিক সতর্কতার হাত থেকে প্রায় সকলেই মুক্তিলাভ করেছেন। কিন্তু আমার বিশ্বাস এইরকম পাঁচজন বৈজ্ঞানিক মিলে ইংলণ্ডের লোকের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বদ্ধ মনের দুয়োর খুলে দিচ্ছে।

যদি কেউ বলেন যে আমি যে নব-মনোভাবের কথা বলছি, সে গত-যুদ্ধের shell-shockএর ধাক্কায় ইউরোপের মনের সাময়িক বিকার মাত্র, তাহ'লে তাঁর কথার কোনও প্রতিবাদ করব না। কারণ যাঁদের ধারণা যে পৃথিবীর সকল প্রকার জীবজন্তুর মধ্যে মানুষ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং মানব সভ্যতার মধ্যে ইউরোপীয় সভ্যতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, এবং ইউরোপীয় সভ্যতার মধ্যে উনবিংশ শতাব্দীর সভ্যতা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, অতএব ঐ সভ্যতা অনুসরণ করা আমাদের চরম আদর্শ; তাঁদের এবম্ভূত ধর্ম্মজ্ঞানের উপর হস্তক্ষেপ করা আমার সাধ্যাতীত। আর তা ছাড়া বিলেতি সভ্যতার মহোৎসবের চিরকাল দর্শক হ'য়ে থাকা আমাদের কারও মনোমত নয়। তবে ও আদর্শ কায়মনোবাক্যে অনুসরণ ক'রে আমাদের মনের চেহারা আমরা সম্পূর্ণ বদলে ফেলতে পারব কি না, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ আছে। আমার বিশ্বাস গত এক শ' বৎসরের শিক্ষাদীক্ষার ফলে, আমাদের দেহেরও রঙ ফিরে যায়নি, মনেরও নয়; যা বদলে গিয়েছে সে হচ্ছে আমাদের বাক্য। আমরা সবাই আজ ইউরোপীয় চলতি বুলি বলতে শিখেছি। আমাদের সাহিত্য ও সংবাদপত্র, আমাদের সামাজিক জীবন ও আমাদের মানসিক জীবনের প্রতিচ্ছবি নয়। এর কারণ ইউরোপীয় ভাবের স্পর্শে আমাদের মন গরম হয় বটে, কিন্তু তাতে বলক ওঠে না।

আমি পূর্ব্বে বলেছি যে—La Renaissance Religieuse নামক পুস্তকের লেখকদের মধ্যে দুই একজন Orientalist আছেন। তাঁদের মধ্যে একজন হচ্ছেন Paul Masson-Oursel। এখন তাঁর দুচারটি মন্তব্য উল্লেখ ক'রে আমি এ প্রবন্ধ শেষ করব। তাঁর মতে ইউরোপের

সভ্যতা এসিয়ার স্কন্ধে ভর ক'রে কোনও সুফলপ্রসূ হয়নি। "কারণ আমরা যে সে দেশে শুধু রেলের গাড়ী ও টেলিফোন রপ্তানি করেছি তাই নয়, কতকগুলি মারাত্মক ismও রপ্তানি করেছি—যথা Capitalism, industrialism, alcoholism, nationalism, এবং সেই সঙ্গে আমাদের spiritual দৈন্য এবং moral বিশৃঙ্খলতা।"—এর ফলে নাকি এসিয়াবাসীর মনে ইউরোপীয় সভ্যতার প্রতি বিদ্বেষবুদ্ধিই প্রবল হয়েছে। Oursel আরও বলেন যে "আমরা Orientalistরা এসিয়ার অতীতকে উদ্ধার করেছি এবং সে অতীতের সঙ্গে বর্ত্তমান এসিয়াবাসীদের পরিচিত করিয়ে দিয়েছি; কিন্তু সে অতীতের প্রতি আমাদের যে কোনরূপ ভক্তি নেই, সে সত্য এসিয়াবাসীরা ধ'রে ফেলেছে।" ফলে এ বিষয়ে তারা আমাদের প্রতি কৃতজ্ঞ নয়। ইউরোপীয় সভ্যতা একটা Asiatic problemএর সৃষ্টি করেছে মাত্র। Oursel বলেন, ইউরোপ এসিয়াতে তার science পাঠাক, কিন্তু তার মনোভাবের যেন আর রপ্তানি না করে। কিন্তু কি ক'রে তা সম্ভব হ'তে পারে, সে বিষয়ে তিনি নীরব। তিনি আশা করেন যে relativity যখন বিজ্ঞানে স্বীকৃত হয়েছে, তখন জীবনেও স্বীকৃত হবে। সকল সভ্যতাই তার স্বাতন্ত্র্য ও বিশিষ্টতা রক্ষা করবে, কেউ অপর সভ্যতার মনের অধীন হবে না। অর্থাৎ মনোজগতেও ঐ Einsteinই আমাদের আক্কেল দেবে। আমাদের সাহেব হওয়াটা Orientalistও বিপজ্জনক মনে করেন।

শ্রীপ্রমথ চৌধুরী।

GHOSH, AT THE
CALCUTTA